



UNIVERSITY RESEARCH PROJECT
विश्वविद्यालय शोध परियोजना

TOPIC:

Swatantrata Purv Hindi Patrakarita Mein Bengal Evam Bangla Bhashiyon Ka Yogdan

विषय:

स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी पत्रकारिता में बंगाल एवं बांग्लाभाषियों का योगदान

Principal Investigator

प्रमुख अन्वेषक

Dr. Ambar Kumar Chaudhary

डॉ. अम्बर कुमार चौधरी

Assistant Professor, Dept. of Hindi

सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग

Rabindra Bharati University, Kolkata-50

रवींद्रभारती विश्वविद्यालय, कोलकाता- 50

Executive Summary (शोध सारांश)

बंगाल का कोलकाता भारत में अंग्रेजी राज का केंद्र था। 1789 में देवनागरी लिपि में छपाई का काम कोलकाता में शुरू हुआ। अर्थात् हिंदी पत्रकारिता को जन्म देने और छपाई का काम शुरू करने का श्रेय इसी कोलकाता महानगर को प्राप्त है। इस शोध कार्य के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता के प्राचीन वैभव और स्रोतों की पड़ताल करते हुए 'स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी पत्रकारिता में बंगाल एवं बांग्लाभाषियों के योगदान को उजागर किया गया है। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि बंगाल और बांग्लाभाषी लोगों ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अनमोल योगदान दिया है। हिंदी पत्रकारिता में बंगाल के योगदान को विस्तृत तौर पर उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस शोध में बांग्लाभाषियों के हिंदी प्रेम और सम्मान भाव को अभिव्यक्त करते हुए उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों और संघर्षों का वर्णन किया गया है। इस शोध में उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चिंतन के विविध आयामों को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रतापूर्व बंगाल की हिंदी पत्रकारिता के द्वारा भाषिक विकास में दिए गए योगदानों को विस्तृत तौर से बताया गया है। तत्कालीन विभिन्न संपादकों के संपादकीय नीतियों को भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य के माध्यम से प्रयास किया गया है कि भाषायी प्रेम और राष्ट्रीय सद्भावना को बल प्रदान किया जाए।

सूनृता

काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये इत्युक्तिं स्मारं स्मारं भारतमनीषायाः गीर्वाणवाण्याश्च वरपुत्रं महाकविकालिदासं तत्रभवन्तो सर्व एव विपश्चितः नूनं जानन्ति, स्मरन्ति च तस्यामरसृष्टिं मेघदूताख्यं काव्यस्यैकदेशानुसारि किञ्चन खण्डकाव्यम् । सम्प्रत्यस्माकमिदं गवेषणकर्म तमेवाश्रित्य खण्डकाव्यं, अपि च तस्यैव खण्डकाव्यस्य इदानीन्तनकालपर्यन्तं काञ्चन टीकामाश्रित्य सुसंहतमिति । मेघदूतस्य आलोचिततमस्य ग्रन्थस्य बहवः टीकाग्रन्थाः सुप्रकाशिताः यद्यपि दरीदृश्यन्ते तथापि ग्रन्थस्यास्य प्रकाशिताः टीकाग्रन्थाः यावन्त उपलभ्यन्ते इतो ऽप्यधिकतया अप्रकाशिताः टीकाः ग्रन्था इदानीमपि नैकविधेषु मातृकासंग्रहालयेषु अनालोचितपतिता विराजन्ते । तेष्वेव अप्रकाशितेषु टीकाग्रन्थेषु मदालोचितेयं तत्त्वदीपिका अपरैका टीका नूनं सहृदयसामाजिकेभ्यो विद्वद्भ्यः रोचिष्यत इति वक्तुं युज्यते । अङ्गवङ्गकलिङ्गजनपदेषु मिश्रोपाधिधारिणः बहवो ग्रन्थकाराः टीकाकृतश्च प्रायः प्राच्यदेशीयव्याख्यातृरूपेण कदापि पुनः वङ्गीयत्वेन सभाजिताः दृश्यन्ते । तेष्वयं भागीरथ-मिश्र अमलाप्रबोधात्मजः तत्त्वदीपिकाकारोऽयमजायत । बहुचर्चितस्यास्य मेघदूतस्य सत्स्वपि सहायकेषु नैकविधटीकाग्रन्थेषु पुनरपरटीकाग्रन्थस्यालोचनेन किमिति चेदुच्यते - नायं केवलं टीकाग्रन्थो ऽपि तु अप्रकाशितो ऽयमपि विद्वदनवगतः । नैदानीन्तनीयाः मेघदूतरसिकाः ग्रन्थस्यास्य रसमिदानीमप्यास्वादितवन्तः । रघुरपि काव्यं तदपि च पाठ्यं, तस्य च टीका साऽपि च पाठ्या इति नियमान्नेदमत्रावधेयं यन्मेघदूतालोचनेनालमिति । अतो हि ग्रन्थस्यास्य सम्पादने सम्पादकस्य प्रयोगप्रयत्नः । कर्मणानेन एका क्रिया द्व्यर्थकरी भूयादिति कृत्वा सम्पादकस्यास्यायं सम्पादनप्रयासः - अप्रवृत्तप्रवर्तनमुपढौकनञ्च कस्यचिद्ग्रन्थस्य । यस्य कस्यापि कर्मणः प्रयत्नग्रहणे अर्थो ह्येव परमार्थतया विराजते इति तावानर्थो नानायासेन लभ्येत चेत् अलमस्तु व्याजान्तरप्रदर्शनेन । अस्मद्विश्वविद्यालयस्य कैश्चनोपाचार्यचरैरस्मभ्यमयमवकाशः प्रदत्तः तेनामूः उपाचार्यचराः धन्यवादारहाः । अवकाशे ऽस्मिन् वारं वारं ईदृशधर्म्यं तेभ्यः प्रकट्यते । अपि च आधिकारिकेभ्यस्तेभ्यः वर्षं यावत् सहायकेभ्यश्चापि तु गवेषणकर्मण्यस्मिन् साक्षात् परिपुष्टिदातृभ्यां ऋद्ध्ययनाभ्यां विद्यार्थिभ्यां सप्रश्रयं कार्तर्यं नूनं प्रकाश्य विरम्यत इति शम् ॥

२८.०३.२०२४

श्रीभास्करनाथो भट्टाचार्यः

प्रधानावेक्षकः, वेदभवनम्, रबीन्द्रभारती

Project Title: Importance of a Growth Pole in Regional Development: A Case Study in West Bengal

By

Dr. Debolina Saha
Associate Professor
Department of Economics
Rabindra Bharati University

Executive Summary

Regional Development can be perceived as a general effort to reduce regional disparities through the support of economic activities like employment and wealth generation in the concerned region. The Location Economics, and thereby the theory of Growth Pole keeps relevance in this area of research. Growth Pole refers to a central location of economic activity or any geographic concentration of interconnected institutions in a particular location. Comprehensive regional planning links the urban centres with their peripheries. The only objective would be to ensure the advantages of robust growth to every individual residing within the Growth Pole area. Reduction in livelihood vulnerability of commons eventually would help cope with and recover from shocks and stresses of life. Even the reduction of economic and social inequalities would help well-being of commons, and thereby, a number of targeted Sustainable Development Goals would also be achieved. In this context, at first this project highlights the growth and deceleration of important industries in Eastern India, specifically in West Bengal, and then, examines the means following which a new growth potential can be identified, using the theory of Growth Pole. In the Eastern region of India, natural resources and cheap labour are abundant in supply. Infrastructural facilities are moderate. Hence, importance should be on encouraging small scale production units which mainly use labour-intensive technique in artistic domains. Their products always have high demand in domestic markets and abroad. The eventual growth of

these production units, and thereby well-being of the people associated with these units may call for regional development.

National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector (NCEUS), in 2008, declared the six pilot project poles in India, where one of them was Panchla and adjoining areas of Domjur Blocks of Howrah District in West Bengal, which are famous for gems & jewellery and zari & embroidery works. NCEUS believed that West Bengal in the Eastern region has high growth potential to prove its efficiency and can revive the past glory; though in another way. At Domjur and Panchla, the co-existence of formal and informal units for gems & jewellery and embroidery works can be seen. Since the demand for the final artisan product always remains high nationally and internationally, so it is expected that coexistence of formal and informal units with proper planning intended for production and marketing might help the growth of these industries, and thereby development of the entire region. Since the two Blocks have a high potential to flourish in future and to be solemnly recognised as an emerging Growth Pole, so from the broader perspective, the purpose of this project is to look upon the recent trends and patterns of the gems & jewellery industry and embroidery works there, and to assess the future scopes considering the present challenges (particularly, after Demonetization, GST implementation (Goods and Service Tax) and Pandemic 2020). The study also assesses the livelihoods of commons in the study area, and their well-being - both objective and subjective. The theoretical argumentation is provided for treating the study regions as Growth Pole, and finally, the study prescribes some policies which may be a help for the State to retain its past glory in the context of sustainable regional development.

সংক্ষিপ্তসার

বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ প্রোজেক্ট

সাল: ২০২৩-২৪

কোভিড পরবর্তী সময়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনলাইন মাধ্যমের প্রভাবঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত ২/৩ জেলার উপর একটি সমীক্ষা

ভূমিকা- কোভিড-১৯ বা 'নোভেল কোরোনা ভাইরাস' নামক এক সংক্রামক রোগের সাথে লড়াই করে দু বছরের কাছাকাছি বাংলা সহ দেশের অসংখ্য জনগণ কে নিজের নাক-মুখ ঢেকে বা মাস্ক ও দূরত্ববিধি মেনে লকডাউন, আইসোলেশন, সামাজিক দূরত্ব (সোশ্যাল ডিস্টেনসিং), কোয়ারেন্টাইন যাবতীয় পরিস্থিতিতে থাকতে হয়েছে। রোগের আতঙ্কে তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েছিলেন গৃহবন্দি বা ঘরবন্দি অবস্থা কাটাতে। এই কঠিন পরিস্থিতি, জন-মানুষের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এর সাথেই শুরু হয়েছিল 'লকডাউন'। অর্থাৎ সব স্কন্দ ও বন্ধ, যেমন- বাস-ট্রাম, অফিস, বাজার, ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পরিষেবা প্রমুখ এবং এর সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে ছিল স্ব জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য কঠোর দূরত্ব বিধি মেনে চলার নীতি নির্দেশ। এই মহামারী পরিস্থিতি শহর থেকে গ্রামীণ অঞ্চলে থাকা সকল জনগণের মধ্যেই রোজগারের অভাবের সাথে অর্থেরও অভাব তৈরি করেছিল।

সমাজে আসা এই নতুন আঘাতের ফলে সকলে অনলাইন পদ্ধতি বা মাধ্যম কে কেনা-কাটার জন্য বেশি করে ব্যবহার করতে শুরু করে। কারণ অনলাইনে অর্ডার করে তারা ঘরে বসে, ভিড় এড়িয়ে সহজে দরকারি পণ্য-বস্তুর চাহিদা পূরণ করতে পারছিল। এই অনলাইন ডিজিটাল (বিভিন্ন এনকোডেড মেশিন পাঠ্যযোগ্য বার্তা) ব্যবস্থা পণ্য কেনাকাটার সাথে সাথে ব্যবসা-বানিজ্যের ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তার বদল ঘটিয়েছিল। যেমন- অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, যেকোনো বিল মেটানো (ইলেকট্রিক/ ফোন/ কেবল/ স্কুল ফিস), মুদিখানার

জিনিস কেনা (হোম ডেলিভারি) প্রমুখ। তাই কোভিড-পরবর্তী যুগে দেখা যায় বিভিন্ন সুবিধাকেন্দ্রিক (চাহিদা অনুযায়ী) অ্যাপের বাড়বাড়ন্ত। অর্ডার দিলেই, বাড়ি বসে হাতে পাওয়া যাবে মনপছন্দ বস্ত্র।

গবেষণার ক্ষেত্র/ অঞ্চল- বাংলার তিনটি জেলা- কলকাতা, হাওড়া এবং বীরভূম।

এই গবেষণার জন্য বাংলার তিনটি জেলা কে ডাটা সংগ্রহের জন্য বেঁচে নেওয়া হয়েছিল। এই জেলাগুলি ছিল- কলকাতা, হাওড়া এবং বীরভূম। কলকাতা ও হাওড়া হল শহর কেন্দ্রিক দুটি জেলা, যেখানকার মহিলা উদ্যোক্তা সহ কলেজ ছাত্রীদের (যাদের ব্যবসা আছে) মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বীরভূম জেলায় গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তা সহ সমবায়ী সংস্থাগুলিকে এই অধ্যয়নের আওতায় নেওয়া হয়েছে। বীরভূম জেলায় কম বেশি বহু মহিলারা নিজস্ব ব্যবসায় যুক্ত এবং তাদের পণ্যের সমাহারও মহিলা কেন্দ্রিক। তাই বহু মহিলা উদ্যোক্তার সাথে কথা বলে ডাটা সংগ্রহ করা গেছে। এই সংগ্রহ কলকাতা থেকে দূর জেলাতেও অনলাইনের বিস্তার ও গ্রহণযোগ্যতা কে তুলে ধরে। গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লকডাউন পরিস্থিতিতে একটি নতুন মাধ্যম কে ব্যবহারে করে মহিলাদের সমতা, ক্ষমতায়ন ও তাদের স্থায়ী এবং টেকসই অর্থনীতির উন্নতি কে পর্যালোচনা করা।

সাথেই যারা (মহিলারা) এই প্রযুক্তি কে ব্যবহার করতে পারেননি। এই শ্রেণীর মহিলাদের অনলাইন মাধ্যমের বিষয়ে অবগত করান এবং তাদের এই মাধ্যমের প্রতি আগ্রহ তৈরি এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার বিষয়টি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মহিলারা মূলত স্থানীয় বাজার, মেলা, প্রান্তিক কেনা-বেচার স্থানে দোকান বা পসরা বসিয়ে ব্যবসা করেন। তাদের মধ্যে অনলাইন পেমেন্ট ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু তারা সোশ্যাল মিডিয়া' মাধ্যমকে ব্যবহারে করতে সহজ বোধ করে না। এই বিভিন্ন শ্রেণির মহিলাদের সাথে কথা বলে ও প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ (২৬৪ জন) করা হয়েছে। এই সকল উত্তরদাতা মহিলারা পেশাগতভাবে সক্রিয় ছিল। মহিলা উদ্যোক্তা- যারা অনলাইন ব্যবহার করেছেন এবং যারা এই মাধ্যম কে ব্যবহার করতে পারেননি। এই দুই শ্রেণীর সাথে কথা বলে বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই ডাটা'র সংকলনের ভিত্তিতে এই অনুসন্ধানটি কে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

লকডাউন পরিস্থিতিতে মহিলাদের ব্যবসার মাধ্যম হিসাবে অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম কে বেছে নেওয়া এবং মাধ্যমের সুবিধা- অসুবিধা ও গ্রহণযোগ্যতা কে ভবিষ্যতের একটি সফল বিক্রির মাধ্যম রূপে দেখা বিষয়টি কে নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ধারণা কে বোঝা। তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা কে উপলব্ধি করা।

অসংগঠিত ক্ষেত্র ও অনলাইন ব্যবসা- দেশের মধ্যে অনলাইন ব্যবসার ৯০% ব্যবসাই অসংগঠিত ব্যবসার ক্ষেত্র। মহিলারা নিজেদের দরকার ও শিল্পগুণ প্রমান করতে এই মাধ্যম কে ব্যবহার করেছিলেন এবং বর্তমানেও করছেন। এটি মূলত মহিলারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সীমিত স্থান ও নিজেদের স্কিল বা দক্ষতা দিয়ে তৈরি সামগ্রীর ব্যবসা বানিজ্য করেন। অর্থাৎ মহিলারা চাহিদা অনুযায়ী জিনিস তৈরি করেন এবং বিভিন্ন চ্যানেল দ্বারা বিক্রি করে অর্থলাভ করে। এই চ্যানেলগুলি বা বিপণন স্থানগুলি হল-

- সরকারি ও বেসরকারি মেলা
- স্থানীয় সাপ্তাহিক বাজার
- নির্দিষ্ট দোকান
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত বিভিন্ন অ্যাপগুলি ফিতে এক্সেসের সুবিধা প্রদান করে। তাই মহিলারা এই সুবিধাগুলিকে ব্যবহার করেন ব্যবসার জন্য। কারণ তাদের অর্থ খরচ হয় না। ফলে অর্থের সাশ্রয়ের জন্যও মাধ্যমটি উদ্যোক্তাদের বেশি করে আকর্ষিত করেছিল এবং বর্তমানেও করছে।

গ্রামীণ মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহিলা উদ্যোক্তাদের একটি শক্তিশালী বিপণন প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য এবং তাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে এবং সহায়তা করার জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এইগুলি হল বঙ্গশ্রী (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প সমবায় সমিতি), মঞ্জুয়া, পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড, বিশ্ববাংলা, তন্তুজ প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সঙ্গে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন গ্রামীণ মহিলাদের লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের জন্য মহিলা স্ব-সহায়ক বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তাদের নেটওয়ার্ক গঠন ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে মহিলাদের কে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম করার পরিকল্পনা করেছে। তার ফলে এই সব সংস্থা গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি পণ্য সরাসরি নিজেদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার ও বিক্রির ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য হল তারা যেন তাদের পণ্য বিক্রি করে পণ্যের ন্যায্য মূল্য দাম পেতে পারে।

তিন জেলার মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে কিছু শ্রেণী তে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত ১৮ থেকে ৩০ বছরের মহিলারা- এদের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে বাবসা করার হার তুলনামূলক বেশি ছিল। এই বয়সের মহিলাদের পরিমাণ ৭০ শতাংশ। দ্বিতীয়ত ৩০রে উদ্ধে মহিলাদের মধ্যে অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা একটু ছিল কম। এবং বাকি ৩০শতাংশ মহিলারা নিজেরা বা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে অনলাইনে বাবসা

করেছিলেন বা করেন। যেমন- বাড়ির শিক্ষিত ছেলে ও মেয়ের দ্বারা, বা স্বামীর সাহায্যে। করোনার সময় এই সকল মহিলাদের অনলাইন মাধ্যমে যোগাযোগের সংখ্যা বেড়েছে। ঘরবন্দি এবং বাজার বন্ধ থাকার কারণে অনলাইন তখন একমাত্র উপায় হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহিলাদের স্থায়ী দোকান ছিল তারাও অনেকে ব্যবসার জন্য অনলাইনকে বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়াও একটি শ্রেণি পাওয়া যায়, যারা অনলাইনে বাবসা করতে জানেন না। তাদের মত তাদের বাড়ির সদস্যদের (স্বামী/ ছেলে-মেয়ে) শিখিয়ে দিলে ভাল হয়। অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য পেলে বা কোনো সংস্থা যদি তাদের এই অনলাইন মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে সাহায্য করে, তাহলে তারা তা করতে চান সেই সংখ্যা প্রায় ৮০শতাংশ। এবং ২০ শতাংশ এমন মহিলাদের পাওয়া যায়, যারা অনলাইন মাধ্যম কে ব্যবহার করতে চায় না। তাদের মত যে দোকান বা বাজারে সরাসরি বসে বিক্রি বা অফলাইন মাধ্যম, তাদের কাছে সুবিধায়ুক্ত।

গবেষণার অনুসন্ধান এবং সুপারিশ/ পরামর্শ- মহিলা উদ্যোক্তাদের অনলাইন মাধ্যমে তাদের ব্যবসার উন্নতি দেখে অন্যান্য উদীয়মান মহিলা উদ্যোক্তারাও এই মাধ্যম কে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন এবং নিজেদের কে সফল ভাবে প্রমাণও করেছেন। এই উদ্যোগ, অন্যান্য মহিলাদেরও আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়ন কে বাড়াতে সাহায্যও করতে পারে।

তাই এই অসংগঠিত ব্যবসা- বাণিজ্যের পরিসর কে কার্যকর নীতি প্রয়োগে সংগঠিত করে তোলা দরকার। দেশের সরকারের পক্ষে পণ্য বিক্রি ও সরবরাহের নতুন মাধ্যম কে সমর্থন এবং তার থেকে আর্থিক লাভ কে অন্বেষণ করে সুরক্ষা বিধি আরোপ করে মহিলাদের জন্য ব্যবসায়িক লাইসেন্স প্রস্তুত করারও প্রয়োজন আছে। যাতে মহিলা ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি না হয়।

এই অনলাইন প্রশিক্ষণের বিষয়টি গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে শেখার ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই কাজের ভিত্তিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সহ অনলাইন মার্কেটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা দরকার তাদের বাড়ির নিকট। এই ব্যবস্থা মহিলাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক শক্তি যোগাবে। তাই এই ডিজিটাল ড্রাইভ কে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রদানের প্রয়োজন আছে। সাথে প্রয়োজন সশ্রয়ী মূল্যে নেট পরিষেবা প্রদান।

উপসংহার-বাংলায় অন্যান্য শিল্পের সাথে কুটির শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা আছে এবং রয়েছে। তাই এই শিল্পের শ্রেণিযুক্ত মহিলাদের দ্বারা তৈরি পণ্য বাজারজাত করার জন্যও ডিজিটাল অনলাইন মাধ্যম উপযোগী হতে পারে এবং তাদের আরও বেশি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ থাকে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় হল সঠিক স্থান অল্প ব্যয় করে ব্যবসা করার পক্ষে। বিশেষ করে মহিলা পণ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য। এখানে নিজের দ্বারা নিজেদের পণ্যের বিষয়ে প্রচারেরও সুযোগ থাকে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনলাইন বাজারের অনুভূতি বা প্রয়োজনীয়তা এবং তার সুফল কিভাবে তারা পেয়েছে বা পেতে পারে, তা অধ্যয়ন করা। মহামারী সঙ্কট, এর উপযোগীতা কে সামনে এনেছে এবং তার ফলে ডিজিটাল দক্ষতার গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতা প্রমাণ করে যে ডিজিটাল দক্ষতা আর অতিরিক্ত দক্ষতা নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি এখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলির মধ্যে থেকে একটি এবং তাই মাধ্যমটি সমাজের সব স্তরের জনমানুষ কে বিশ্বের দরবারে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেয়।

মাধ্যমটি স্ব-কর্মসংস্থানকারী মহিলাদারকে প্রভাবিত করছিল, যার মধ্যে বাঙলার কর্মজীবী মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সরবরাহ শৃঙ্খলার বাধার কারণে। গবেষণাটিতে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসার উপযোগী স্থান ‘অনলাইন মাধ্যম’, তথ্যের ফলাফল অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। মহিলারা যে এই মাধ্যমের প্রতি আকর্ষিত, তা প্রমাণ করে মাধ্যমগুলির আগ্রহী দর্শক সংখ্যা দেখে। অনেকাংশে মহিলারা যারা মাধ্যমটি কে ব্যবহার করতে পারেননি। তারা মাধ্যমটি শেখার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে অনেকের দেখাদেখি বহু মহিলারা, নিজেদের প্রতিভা কে প্রমাণ ও প্রকাশের জন্য মাধ্যমটি কে প্রতিনিয়ত বেছে নিচ্ছেন। সেটিই হল এই অনলাইন ডিজিটাল মাধ্যমের সাফল্য।

ডঃ দোলনচাঁপা গাঙ্গুলি

এসোসিয়েট প্রফেসর

এপ্লাইড আর্ট (ফলিত কলা বিভাগ)

দৃশ্যকলা অনুষদ

রবিন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৫০

Principal Investigator, URP (2023-2024)

**Executive Summary of the University Research Project (URP)-2023-24
entitled**

**Therapeutic Application of Tagore Songs with a simultaneous Study
of the contemporary Reception of the Art Form both in the
perspectives of the Performers and the Listeners**

**Principal Investigator: Dr.Durba Singha Roy Chowdhury,
Department of Rabindra Sangeet**

Research Problem - Tagore said in his essay ‘Sangeet O Bhav’, “my appeal to music students is to explore the science of what sounds, arranged in what way, conveys what feelings, and why. Instead of paying attention to what is the melody and what is the dissonance in the origin, Iman-Kalyan, Kedara, etc., be inclined to discover what is the melody and what is the dissonance in the ragini of sorrow, happiness, anger or surprise. Oshaltan Kedara etc. are artificial Ragrahini created by man, but our Ragrahini of happiness and sadness is not artificial. All these angers are hidden in our normal speech. Abandoning some meaningless names, let us name Ragrahini differently according to the names of different bhavas. In our music school, there is a class of melody practice and Ragrahini education, there should also be a class of Ragrahini's bhava education. Just as now, when listening to music, everyone says, "Bah, how sweet it is," the day will never come when everyone will say, "Bah, how beautiful."

Unfortunately no attempts were made by the Scientists or the artists.

The Proposed Solution – 1. School students and College students of almost all districts of West Bengal, who know music as well as who do not know music, were surveyed for this study. This study shows that the combination of lyrics and tune of Tagore Song is influencing the minds of most of the student.

2. A survey was also made for the artists and music lovers of various important field other than Rabindra Sangeet. Amost everyone reported that Tagore’s Music and Lyrics relieved their work stress.

3. ‘Sir CV Raman Centre for Physics and Music’ for the first time undertook this Scientific research which was possible due to excellent brain sensors available and at the same time the methodology for analysing Complex systems was also

recently developed. I got the opportunity to interact with them and used my data on music to analyse acoustically and also neurocognitive perspective. The EEG data is analysed in the same way as the acoustical signal using MFDFA. We can show the results of EE analysis in case of a happy or a sad song. This experiment has been conducted at sir CV Raman Centre for Physics and Music. The results of analysis is shown above with the help of a bar diagram. The plot speaks for itself from MW values. It is clear that in all lobes, MW values are significantly different for happy and sad songs. In case of sad song MW values are much higher. These are relevant in the experimental analysis for the response of human being for different kind of music signals. Tagore wanted this answer from the scientists to his question that why different melodies carried different emotions.

The Value - Thus, we can see after all these assimilation, his appeal to God in his songs got converted into pure love. From 'Mahua' - his songs, his poems are filled with unpolished, unalloyed, genuine love, in which there is no complexity, no tangle but it is very profound, very deep. If we closely analyse Tagore songs we can feel that he counsel himself with his own life's philosophy. If we could have touched a little, it purifies our entire soul.

Executive Summary
for
University Research Project 2023-24

**Designing Costumes for Performances based on Classical Indian
Drama in the Contemporary Period**

Principal Investigator

Dr. Gagandeep
Assistant Professor
Department of Drama, Faculty of Fine Arts
Rabindra Bharati University, Kolkata

The significance of costume design in theatrical productions, particularly focusing on its role in classical Indian drama performed in contemporary times. Costume design is highlighted as crucial for visual impact, conveying character details, and fostering emotional connections with the audience. The research aims to explore how costumes in classical Indian drama reflect cultural and historical contexts, drawing from rich traditions and diverse regional styles. It acknowledges the challenges faced by designers in balancing historical accuracy with modern interpretations, often guided by ancient texts like *Natyashastra*. The study intends to analyze various production approaches, examining how they harmonize classical aesthetics with contemporary sensibilities to create compelling narratives. Ultimately, it seeks to contribute innovative insights for costume designers navigating the intersection of tradition and modernity in theatrical costume design.

This research aims to explore contemporary methods and processes in costume design for Classical Indian Drama productions. It focuses on uncovering sources of inspiration used by costume designers, documenting specific designs and the intricate design processes involved. Additionally, the study seeks to analyze the convergence of classical and contemporary elements in costume design, highlighting evolving theatrical aesthetics. It also aims to compare these approaches across different productions to reveal the diversity within costume design practices. Ultimately, the research aims to develop a cohesive framework that integrates contemporary contexts while honoring classical traditions, contributing to the advancement of costume design in Indian theatre.

The scope of this study encompasses a comprehensive exploration of costume design in Classical Indian Drama, encompassing not only traditional forms but also adaptations in various styles. The term 'costume' refers to the complete visual portrayal of characters, including apparel, accessories, jewelry, hairstyle, and makeup. In theatrical production, costume design involves collaboration among the director, designer, and actors, with significant emphasis placed on the director's vision and the actor's embodiment of their character visually.

The research initially aimed to study ten representative plays performed between 2017 and 2022 across India, considering performances from diverse regions and languages. However, due to limited recent productions, the scope was adapted to include

primarily performances from academic institutions such as University of Hyderabad, Punjab University, Viswa Bharati University, and others. Additionally, plays by individual artists and amateur theatre groups were also included in the study.

Overall, this research aims to document and analyze the costume design practices in contemporary Classical Indian Drama productions, highlighting the roles of directors, designers, and actors in shaping visual narratives on stage. The methodology of this research project involves several key steps:

Literature Review: The researcher reviewed various sources including 'Natya Shastra' translations, play reviews, articles, research papers, and books related to costume design in Indian and Western cultures. Libraries in Kolkata, Delhi, and Punjab, as well as online resources, were utilized for gathering this literature.

Data Collection: Productions in Classical Indian Theatre and adaptations of ancient Sanskrit plays were identified through searches and video reviews. Directors, actors, and costume designers involved in these productions were identified and shortlisted. Questionnaires were developed separately for actors, directors, and costume designers, and interviews were conducted online using platforms like StreamYard and Google Meet.

Analysis: Literature and interview data were analyzed to identify themes and insights related to costume design in Classical Indian Drama. This analysis formed the basis for further research questions and conclusions.

Overall, the research methodology emphasizes a thorough exploration of both theoretical and practical aspects of costume design, integrating insights from practitioners and scholarly sources to illuminate the complexities and evolution of costume in Indian theatre.

The literature review for this research project began with a detailed study of Chapter 23 of 'Bharata's Natya Shastra', known as 'Aharya Abhinaya'. This chapter, comprising 223 verses, extensively covers the dress and makeup guidelines for actors as prescribed by Bharata Muni. Three translations of Natya Shastra were consulted: Manmohan Ghosh's English translation, Babulal Shukla Shastri's Hindi translation,

and Dr. Sureshchandra Bandyopadhyay and Dr. Chhanda Chakraborty's Bangla translation.

The study focused on various aspects outlined in Natya Shastra:

- Definition and importance of 'Aharya Abhinaya'
- Types of 'Aharya Abhinaya'
- Details of 'Pusta' (set and props making)
- Types of garlands, jewelry, and their application
- Instructions for makeup, including colors and styles for different characters such as divine and humane, based on geographical and cultural contexts
- Philosophical aspects of costume and makeup
- Specific guidelines for different types of characters, including types of beard and costumes for male actors
- Symbolic use of colors and their application based on characters' attributes and roles

The review also encompassed an exploration of related literature from both Indian and Western sources, gathered from libraries in Kolkata, Delhi, and Punjab, as well as online resources. The focus was on understanding the evolution of costume design in Indian theatre, with insights drawn from scholarly articles, research papers, and periodicals. However, the literature review identified a gap in recent scholarly works specifically focusing on the application of Natya Shastra principles in contemporary Classical Indian Drama productions. This gap directs the research towards filling the void by analyzing current productions and their adherence to or deviation from traditional guidelines outlined in Natya Shastra.

Literature Gap

To be precise, the available literature that we have found and evaluated till now is focused on 'clothing' rather than on 'costume design'. There are books available on the process and evolution of costume designing and on the perspective and philosophy of various costume designers. However, none of such books concerns Classical Indian Drama. To be exact, none of such books concern India at all. Whatever study on Indian costume is available, be it ancient or contemporary, they are mere descriptions of different kinds of apparels used or seen in the ancient temples and 'stupas' of India.

These descriptions are carefully done, explained with minute details with the help of both photographs and drawn plates. But still, they do not lead us to any process or method of costume designing and making for Classical Indian Drama. The Twenty-Third chapter of 'Bharata's Natya Shastra' tells us about some instructions regarding materials and colors. But again we have found that there is a difference of opinion among the experts regarding the actual and constant meaning of these Sanskrit 'shlokas'. The costume designers or directors who claim to follow the 'Natya Shastra' as it is or to take inspiration from it, have never published or discussed in a book about their process specifically. The way the worldly acknowledged method books on costume, for example, 'The Costume Designer's Handbook' by Rosemary Ingham and Liz Covey, explain the principles behind the decision making regarding costume in the Western World, we are searching for something similar regarding costume design in Classical Indian Drama today.

But after a very detailed literature review it has been found that even the best of the books serve as mere research reference for the designers but no insight has been provided in any of the books regarding how to approach the design or even how these references should be executed. That way the titles of most of these books saying 'costume design' seem misleading as these can be called books on the clothing but not costume design. This is a huge literature gap rather void where no work has been done at least in Indian books.

The findings from the interviews conducted with various practitioners in the field of Classical Indian Drama reveal several points of contention and confusion.

1. Living Tradition of Classical Indian Theatre: There is debate among practitioners regarding what constitutes a living tradition of Classical Indian Theatre. While some, like Manish Mitra and Chandra Dasan, firmly assert that forms like 'Kutiyattam' represent living traditions, others like Sayak Mitra suggest that these forms, including 'Kutiyattam', are merely traditional and do not necessarily adhere strictly to the principles outlined in 'Bharata's Natya Shastra'. This raises questions about the application of Natya Shastra's theories across different traditional forms and the influence of regional variations on costume and performance styles.

2. Interpretation and Translation of Natya Shastra: Scholars such as Dr. Gautam Chatterjee have pointed out discrepancies and challenges in the translations of 'Bharata's Natya Shastra'. The reliance on commentaries like 'Abhinava Bharati' by Abhinavagupta for deeper understanding further complicates the interpretation of the original text. This leads to varied interpretations among practitioners, affecting how they apply Natya Shastra's principles, particularly in costume design and makeup.

3. Costume Design Challenges: Practitioners like Pinki from Chidakash Kalalaya emphasize the complexity of applying Natya Shastra's guidelines practically, especially concerning details like the number of draping layers and specific ornaments for different characters. The adaptation of these guidelines to modern productions often requires compromises due to practical constraints and regional influences.

4. Body Types and Character Representation: The issue of adapting character appearances to fit Natya Shastra's ideals, as seen in Chandra Dasan's adaptation of 'Shakuntala', raises concerns about actor comfort and authenticity. For instance, padding used to achieve a desired look can hinder actor performance and audience reception, as noted by actors like Snehalata Tagde and Abhilasha B. Paul.

5. Relevance and Reconstruction of Classical Indian Theatre: The research highlights the challenge of reconstructing Classical Indian Theatre based on ancient texts amidst modern interpretations and practical considerations. The term 'classical' itself is debated, with emphasis on the theoretical underpinning found in Natya Shastra versus the practical challenges and adaptations required in contemporary productions.

Overall, the interviews underscore the complexity of reviving and interpreting Classical Indian Theatre, with significant discrepancies in understanding Natya Shastra's principles and their application in modern times. This research aims to navigate these complexities and contribute to understanding how ancient theories inform contemporary practices in Indian theatre.

Conclusion:

The exploration of visual references in understanding ancient Indian attire reveals complexities and challenges inherent in relying solely on ancient visual artworks. While these artifacts offer valuable insights into past civilizations, their limitations as

accurate costume references must be acknowledged. Moreover, the examination of ancient art prompts critical reflection on the objectification of the human body, highlighting the need for nuanced interpretations that consider historical context and cultural perspectives. By embracing a multidimensional approach to research, scholars and practitioners can navigate the intricate tapestry of ancient visual culture with greater awareness and sensitivity.

The art of 'costume designing' for theatre, as we understand it today, has some of its own techniques and grammars. Of course, it varies from culture to culture but yet we try to create a meaning through the design which enhances the sense of the play and in case of costume, also the establishment of the character. Be it modern or traditional theatre, be it the theatre of any region or community --- the line, colour, texture, cut, material of the costume speak about the character who is wearing it. It is needless to say that it is also a reflection of the time and space of the play. That is why the search for references or the pre-production research is often a comparatively longer part than the execution itself in case of costume designing. Now, since the text telling about the codified costume and styling for the classical Indian plays or the 'Sanskrit plays' has points of confusion and has certain difficulties in execution, the image of these costumes which the larger mass of this country has strongly set in their minds is the gift of the popular genre. To be specific, the image is something similar to the T.V. show '*Mahabharat*' created by B.R. Chopra and directed by Ravi Chopra which was broadcast on Doordarshan in 1988. Though, many of the contemporary directors and designers consciously try to deviate from that image, sometimes the work which they ultimately produce, shows hints of confusion. Although we can find an entirely different visual of the actors in the 1989 film '*Mahabharata*' directed by Peter Brook --- which was actually inspired by his play under the same title in 1985, the idea of that sort of a visual seems to be confined in a rather smaller elite circle in the later times. The journey of this research had started on this note.

After completing the research process, it becomes evident that traditional guidelines for costume design, such as script analysis, character definition, and research into historical context, are indeed essential. However, a thorough understanding of the *Natyashastra*, particularly its twenty-third chapter, further enriches the costume design process for classical Indian drama. Despite these established principles, designers and

directors may interpret and approach the same material differently, leading to diverse creative outcomes.

The major objective of this research was to get to the various approaches which can be taken for designing costumes for the productions based on Classical Indian Drama. After going through the whole journey of this research, some approaches have come up quite prominently. For example, for the noted director Manish Mitra from Kolkata, Aharya comes last. He uses modern symbolism for directing his plays and for the aharya abhinaya as well. Also this whole process of aharya abhinaya, for him, is more collaborative where the actors have a lot to say.

On the other hand, for the renowned director Satyabrata Rout, retired professor from Central University of Hyderabad, now based in Bhubneshwar, the paintings of Raja Ravi Verma have been the major inspiration. Unlike Manish Mitra visuals are of utmost importance for him. He is a painter himself and tries hard for finding his inspirations from the paintings only. Rather than looking at the details in Natyashastra, his aesthetics matched more with the visuals given by Raja Ravi Verma.

The director like Chandra Dasan made tribal culture as his base for Shakuntala but then could not leave behind the traditional standards of beauty which at times made the actresses not very convinced. The known costume designer Amba Sanyal takes her inspiration not only from Natyashastra but also from the architectural motifs of that period. There has been a discussion regarding the unstitched costumes and the earthy colors as has been discussed by the renowned theatre director parvez Akhtar; but there have been very clear details of colors in Natyashastra; which points out to some prejudices of conceptions regarding that period too.

Following may be one of the many approaches for designing costumes for the productions based on Classical Indian Drama:

Script Analysis and Character Definition: Traditional rules dictate that costume design begins with a deep analysis of the script and a clear understanding of each character's personality, motivations, and journey within the narrative. This foundational step remains crucial, as it informs the designer's choices and ensures that costumes align with the dramatic context and thematic nuances of the play.

Researching Time and Period: Another essential aspect of costume design is researching the historical time period in which the play is set. This involves studying

historical costumes, textiles, and accessories to accurately reflect the cultural and social context of the narrative. By immersing themselves in the period's aesthetics and fashion trends, designers can create costumes that enhance the authenticity and visual impact of the production.

Understanding the Natyashastra: The Natyashastra, an ancient Sanskrit text on performing arts attributed to Bharata Muni, provides comprehensive guidelines for various aspects of theatrical production, including costume design. Chapter twenty-three specifically addresses costume-related topics, offering insights into garment construction, color symbolism, makeup, and ornamentation. A thorough understanding of these principles enriches the designer's creative palette and ensures adherence to classical aesthetic ideals.

Interpretation and Creativity: Despite the established principles outlined in traditional guidelines and the Natyashastra, costume designers and directors may interpret and approach the material differently based on their artistic sensibilities, conceptual vision, and cultural background. While some may adhere closely to classical conventions, others may adopt a more innovative or experimental approach, drawing inspiration from contemporary art, fashion, or cultural influences. This diversity of interpretation adds richness and depth to the creative process, allowing for a range of stylistic expressions and artistic interpretations.

In conclusion, while traditional rules and guidelines provide a solid framework for costume design in classical Indian drama, a thorough understanding of the Natyashastra, combined with individual creativity and interpretation, enhances the designer's ability to create costumes that are both authentic and artistically compelling. By striking a balance between tradition and innovation, designers can effectively bring the timeless beauty and cultural richness of classical Indian drama to life on the stage.

Last Five Years of Sardar Vallabhbhai Patel and His Role in the Making of Modern India

Hitendra Kumar Patel

This study is focused on last five years of Sardar Patel's life. In this phase, the negotiations with the British and the Muslim League was led by him and Jawaharlal Nehru. He was probably the first leader of Congress heavyweights to realize that the Partition was the only way out. He converted to the Partition probably in the end of 1946, according to some, and thereafter he managed to carry Congress (including Gandhi) with this decision. After the Independence he had confronted great challenges such as large scale migration, communal violence and administration of Independent India. The other great responsibility he took was to anchor the process of integration of 563 princely states with Indian Union. This was a historical work which earned him the title of "Bismarck of India." In a book a historian has titled his biography as *The Man Who Saved India*.¹

There is an opinion that in this process Sardar worked 'independently' from Gandhi. Deeply attached to Gandhi at personal level, Sardar Patel found in this stage that Gandhian ideals were proving hindrances for national cause. Sardar had differed from Nehru, whom he loved but he never accepted as his leader till Gandhi died. He trusted his leader –Gandhi and he knew that the great leader would ultimately understand his moves and decisions, but the fact remains that he took decisions which, he thought, were in the best interests of his nation. Nothing was more important for him than the nation's interests. He was more a nationalist than a Gandhian in this phase. If he found that Gandhi thought otherwise, he showed courage to go by his own assessment.

It has been said to the credit of Vallabhbhai Patel that he created the modern state of India out of myriad fragments.²Other leaders' appreciation for his work as a unifier and a "builder and consolidator of a new India" (Nehru) would be mentioned later, but it needs to be said that for Patel, these five years had been most difficult years as he was targeted for his decisions. For

¹ Hindol Sengupta, *The Man Who Saved India Sardar Patel and His Idea of India*, Penguin, Delhi, 2018.

² N. C. Suresh in Hindol Sengupta, op. cit., p.VII.

many, he systematically destroyed the possibility of an Indian revolution which India needed. He sided with Capitalists, conservative feudal forces and did not allow the labour unions to put pressure on Government to get concessions for the labour force.

In this work a look into the critics'opposition to Patel looked necessary without which it is difficult to understand how Patel's nationalist political philosophy was perceived by his critics. He was criticized by many as a Hindu leader who was not just to the Muslims. Taking some of his moves and utterances there was an attempt to portray him as a leader who was, unlike Gandhi and Nehru, a social conservative and political leader who did not have such great belief in democracy and secular values as Nehru had. In fact, a vicious campaign successfully dubbed him as a Hindu sympathetic leader who wanted the concentration of all Hindus in India. During this phase his differences with Jawaharlal Nehru, now the Prime Minister, were perceived as on communal ground and even Gandhi was made to believe that Patel was not following Congress ideals and behaving like a partisan Hindu leader. It pained Patel but he remained in control of his emotions and despite many odds never tried to oust Nehru for the larger national interest, one may say. He remained supportive of Nehru government and he collaborated with the Prime Minister in spite of many mistakes Nehru made. They both carried the association till the end as a tribute to Gandhi, their common bond.

Two researchers on Patel have recently written that, "What makes it important to revisit Patel's legacy, especially in the light of the continuing Kashmir issue, is the tendency of the Nehru narrative to overreach other discourses. Apart from this discourse correction, post 2014, steps taken to focus on the legacy of Sardar Patel invite the rhetoric of appropriation."³ This has been said in the context of Kashmir but it can be considered true in other cases also. Sardar Patel had not been given his due respect. But the issue here may require a deeper analysis of history of Indian National Movement which had been deeply influenced by the forces unleashed in the post Civil Disobedience Movement years.

Throughout the 1930s, there was a deep struggle in the rank and file of freedom fighters to decide how the movement should proceed. There were two trends within the Congress. Most of the senior leaders were with Gandhi and his non-violent struggle in which the class conflict was ruled out and the focus was on pressure-compromise –pressure technique of political

³ Sonali Chitalkar and Rahul Chimurkar, 'Patel and the Accession of Jammu and Kashmir', in Shakti Sinha & Himanshu Roy, *Patel: Political Ideas and Policies I*, Sage, New Delhi, 2019, p. 138

mobilization.⁴ In this strategy the issues between the peasants and the zamindars and the workers and the mill owners were not to be allowed to go to the clash points. The real objective was to get a national consensus, national unity against the colonial masters. This group was led by Sardar Patel and his colleagues. For this group Gandhi was the last authority. The other group was led by young leaders who wanted a different strategy in which the class conflict was not ruled out. This group did not want to postpone the struggles for peasants and workers for future and they wanted anti-imperial struggle alongside peaceful class struggle. This was led by leaders like Nehru, Subhas, Jay Prakash Narain and others. These two are described differently as ‘rightists’ and ‘leftists’. In short, the rightists did not want to take the path of confrontation with the British and the leftists were those who wished to combat the British rulers with the help of people. There were different variants of both these rightists and leftists of 1930s but the main issue was whether to go for an intense struggle with the colonial authority or to get the desired result –the independence without sacrificing people in the process.

The flash-point of this internal struggle reached in 1938-39. It came out in open when Subhas Chandra Bose dared to challenge the rightists and gave the call to wage a struggle against the British. This was “indiscipline” for the rightists and they ensured that Bose did not get the platform under his control. Patel had to be the decisive figure who led the rightists. He led the ‘nationalists’ and ultimately this group prevailed in 1939.

In between 1939 and 1942, Gandhi waited, but ultimately he gave the call of Quit India and thus began a struggle. This was given at a time when the British were primarily engaged in the Second World War. The worst phase was over for them and they managed to suppress the Quit India Movement. The 1942 Quit India Movement petered out soon and the Colonial authority was in command by October 1942. Now the leaders could look forward to another phase of mass movement once the opportunity arrived. Those who had chosen to continue the path of struggle continued to oppose the colonial rule but their popular base was limited and there was a lack of coordination among them, so these movements were never seen as a serious challenge.

Meanwhile, a serious challenge emerged in the form of communalism which posed the threat of division of country. This came from within, so Gandhi tried to avoid any fight with the leaders of communal campaign for Pakistan. In his overall political strategy no non-English force

⁴ Bipan Chandra has argued decades later that the Gandhian technique against the Colonial rule was to put pressure and then compromise just to prepare for another round of political pressure on the British. This P-C-P technique enabled the Congress leadership to avoid any crackdown on their supporters by the Government. (For details see Bipan Chandra, *The Struggle for Independence*, Penguin, Delhi, 19)

was enemy, so he tried to avoid it by internal negotiations. These negotiations were failed. The future course of politics remained uncertain.

It has been argued by some that when the leaders of the rightists, who did not consider the path of 'revolution' necessary, were feeling the pressure from two ends –first from the communal campaign and second from the revolutionary forces who, they thought, were out to create a chaos in India. The rightist had now the support of one of the two leftist stalwarts – Nehru. The second –Subhas Chandra Bose had gone out of Indian political scene by opting another course of action. In this altered scenario, the rightists charted the plan of capturing the power as quickly as possible. These leaders –led by Patel and Nehru –were out of jail to get the power quickly save Indian nation from both –the communal Muslim League and revolutionary forces. The Socialists were caught in between the two strands –national and revolutionary. Their dilemma can be clear by a statement of Jayprakash Narayan. Jayprakash Narayan wrote a letter to Patel in 1947: “as long as we felt there was a possibility of an open struggle with the British, we did try to make preparations ...Of this we never made a secret. In fact, in my public speeches during those days I always indicated that the struggle if it came would be of the nature of a much vaster and bigger '42. But since it was made clear that no open conflict with the British was necessary, we have stopped all such activities completely.”⁵

If one closely look into the proceedings, reports and communication it would be clear that functionally Sardar Patel was the most important leader of the group referred as 'nationalists' at the political level. M. N. Roy, a great leftist ideologue and an intelligent reader of political situation found him the most significant leader of the nationalists in India.⁶ This is a fair statement if the organizational works of Congress is taken into consideration as a vital factor in the Congress led national movement.

⁵ J P wrote this letter on 11 June, 1947

⁶ M. N. Roy had written after the death of Patel: “ In the two weeks since the virtual leader of the nationalist India passed away, leaving vacant a position that he had held for thirty years. His death is in fact greater loss than that of the Mahatma. The latter is honoured as the Father of the Nation. What India is today, however, is rather a creation of Patel than of his master.” (M. N. Roy, *Men I met*, Lavani Publishing House, Bombay, 1968, p. 18.

If we take the assessment of M. N. Roy seriously we need to see how this leader of nationalists had planned and pursued his political agenda in an age when things were quite complex and there was no real picture of a new Indian nation.⁷

In this story of Sardar Patel there is one angle which can be called Savarkarite angle which has not been given much attention. This view has been presented most clearly by Dhananjay Keer, a biographer of Savarkar. His principal argument was that Patel used the Savarkarite line after Wavell's Shimla meet. He has given some instances to suggest that after Gandhi's efforts to reach out to Jinnah came into light Patel was very upset and he threatened to leave Congress if these kind of secret moves were made again. He has also argued that when the Wavell's declaration came after the meet, Hindu Mahasabha was unable to put Hindu Mahasabha case strongly and in between this declaration and the crucial elections of 1945-46 which put a stamp on the demand of Pakistan by the Muslim voters Patel was able to follow the anti-League line to get the initiative for the Congress. At that time Savarkar was unable to actively take part in the election campaign and thus Patel was able to project Congress as the representative of all Hindus.⁸

Any comprehensive assessment of a historical figure like Sardar Patel is a very time taking process as the materials are massive and interpretations are very confusing. This confusion is not due to the lack of materials as such. The real confusion is due to the approach of historians and writers who have tried not to tell the story of these years dispassionately. Most intriguing is the way four key personalities have been dealt with. The pressure of keeping Nehru and Patel's struggle separately is most problematic. One is seen as an idealist and other the pragmatic as if the fruits of the pragmatic man's did not reach to the idealist!⁹ As a result of historians' selective

⁷ In this connection Jawaharlal Nehru's broadcast message of 3 June, 1947 is an interesting document. It has four interesting observations which do not gel together. He says : “ (Due to the works of Interim Government under Nehru in last eight months) India has advanced nationally and internationally, and is respected today in the councils of the world...You know well the difficulties which the country had to face, economic, political and *communal*(emphasis added)... At no time we lost faith in the great destiny of India...For generations we have dreamt and struggled for a free, independent and united India. The proposal to allow certain parts to secede if they so will is painful for any of us to contemplate.” (K. M. Munshi, *Indian Constitutional Documents: Pilgrimage to Freedom* Vol II, Bharatiya Vidya Bhawan, 2013, p.189-199)

⁸ For specific references to arguments along these lines see Dhananjay Keer, *Veer Savarkar*, Popular Prakashan, Mumbai, 2019 [originally published in 1950 under the title : Savarkar and His Times], pp. 368-369 and elsewhere in the book there are several quotes which try to argue along this line.

⁹ In this connection a reading of Kuldip Nayar can give an idea how there has been an unnecessary pressure on writers to be negative towards Patel. He writes: “Vallabhbhai Patel was anxious that all

approach an ambiguity has crept in. Also, there is an element of criticism of Gandhi's expression of shock over the Congress leadership's acceptance of the partition of the country. B. R. Nanda has made a pertinent observation that to historian, it is a fact that since 1940, when the Lahore resolution for Pakistan came up, the "Congress had been continually softening its stand under the impact of the League's strident propaganda and the confrontation with the British rulers."¹⁰

It would not be possible to take into consideration all these angles in this work. It is mentioned here to suggest that any study of Sardar's political moves of this phase needs more research from different angles.

In this work some of the key elements such as overall assessment, his engagements with different issues as they came and his public response are addressed. Some of those issues on which many scholars have already worked such as Kashmir, Hyderabad, Junagarh are not discussed in details. In this work the main attention is on Patel's political engagements and his overall approach to see what was needed to be done to the best interests of the country.

It needs to be said that Indian leaders were not in the process of mobilizing the people during this phase. They were more into working on the process of inheriting the power from the British Raj. Once that was worked out between the Government, Congress and the League there were issues of transfer of power and sharing the resources. With the transfer of power to two Constituent Assemblies in 1947, the challenge of solving the issues the nascent nation state was confronting with. This involved keeping the Congress interests and government's control over the system. Patel was in the thick of things in all these without leaving the legacy of the National Movement. There were challenging political forces in the country which found Patel as a leader who represented nationalist interests and not the socialist project which they liked to believe was Nehru's project too. It seems there was an illusion among many Socialist and Communist leaders that Nehru was unable to carry his socialist ideas because the Congress was in a nationalist leader Patel's control. That made Patel a target for those leaders. Nehru and his supporters allowed this

Hindus and Sikhs should leave West Pakistan; he cared little for the Muslims who he thought had better leave India as they had achieved what they wanted: Pakistan. (p.9) ... As Muslims were not safe on the streets of Delhi, most of them moved to Purana Qila for security...Strangely, both Patel and the president of the constituent assembly Dr Rajendra Prasad, reacted strongly to Jawahral Nehru's proposal to reverse certain residential areas in Delhi for Muslimism... It reflected the general anti-Muslim bias. (p.15) One can see similar observations in this book in which Patel was seen negatively who had seen the partition days and was well aware of the details. He had worked with the prominent leaders and had interacted with Lord Mountbatten and many important office bearers of those day later. (See Kuldip Nayar, *Beyond the Line: An Autobiography I*, Roli, Delhi, 2018 [2012])

¹⁰ B. R. Nanda, *In Search of Gandhi: Essays and Reflections*, OUP, 2002, p. 149-150

to happen not to belittle Patel's influence in the Party and the Government, which was unlikely to happen, but to keep a distinction between the secular, liberal and a follower of Gandhi Nehru and a communal, conservative and rightist Gandhi supporter such as Patel, Rajendra Prasad, Rajgopalachari and G B Pant. This was unfair to Patel and his policies. A proper scrutiny had never been made how Patel can be considered communal. An exhaustive biography of Sardar Patel written by Rajmohan Gandhi has made it clear that Patel never attempted to pose as a leader of both Hindus and Muslim. His heart was a Hindu's heart, to use Rajmohan Gandhi's phrase, but he was just and he sincerely believed that the Muslims, who had till the Independence had supported the Pakistan movement could not become Indian in heart overnight. In one of his most controversial speeches, delivered in Calcutta, he had expressed his opinion in a clear language. A discussion on this passage will be taken up in the third section of this project report. He wanted the Muslim leaders to come clean over it and he wanted their expression of support for Indian government. If we compare his attitude and that of Maulana Abul Kalam Azad then it becomes clear that by no means Patel can be considered communal if we consider Maulana a secular.

Sardar thought in a manner which made sense to people who understood the dynamics of politics better. He tried to see processes and people in which commitment to national cause remained of paramount importance. Here it can be mentioned that Once Sardar Patel decided to follow the non-violent political path of Gandhi and Congress he remained totally committed to that. While serving the organisation and the country he made some difficult decisions which were not likely by some, but this did not make much impact on him. In the post Chauri Chaura situation when many Congressmen, including some prominent ones, were against the withdrawal of the movement by Gandhi, Vallabhbhai remained Gandhi's biggest political supporter. 1927 onwards, particularly after 1936 the pressure to take up issues related to peasants was mounting on the Congress. In 1928 Vallabhbhai Patel leading a peasant movement at Bardoli (Surat, Gujarat) was seen as a sign of success of Congress led peasant movement, but he never got tempted to drift towards any radical line. In fact, this clear cut pragmatic Gandhian approach elevated Vallabhbhai to a national leader with a difference. Vallabhbhai always said and maintained that he was a disciplined soldier of the Congress and Gandhi. He was likely to be the President of Congress in a vital session of Karachi in 1930, but as mentioned before, when he found that Gandhi wanted his friend's son and a young leader to be the President, Patel accepted that. Discipline, organisational interest and the national interest were three cardinal principles which Sardar followed. If he accepted any principle then he tried to put all his energies behind that. He was a keen observer and a good reader of situation. To him, the Congress was being

weakened due to organisational deficiencies. There was no real discipline which could guide the Congress. The Congress represented various kinds of views and interests. He could notice that some new forces, who preferred to see the senior and older leaders as conservative, were trying to guide the Congress in a different direction after the Civil Disobedience Movement. He was quick to realise that most of these new forces were carrying links with those who tried to counter Gandhi ten years ago. He quickly made necessary preparation to counter this line of political actions in the nineteen twenties.

Sardar Patel, unlike Subhas Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, focused more on organisational aspects of movement and he did not think that senior leaders in general and Gandhi in particular had lost their relevance. So, to guide the Congress his prescription was simple. He wanted the Congressmen to follow Congress Working Committee and Gandhi. He knew that if that control was not applied there was a chance that the Congressmen could move in different directions. From this point, he took over the real charge of running the Congress with strictness only he could afford. Gandhi had been in the role of guide. He gave the lead and the entire responsibility of how to execute his plans was the responsibility of Patel. He was the real boss of the Congress 1934 onwards.

From 1934 to 1939, Sardar had to deal with some tricky issues. Initially he had reasons to be uncomfortable with the Socialists, who respected Gandhi but disliked Gandhi's most trusted organisation man Patel. How Patel tried to deal with Socialists and the challenge of Subhas Chandra Bose in 1938-1939 is a quite complicated story. Some of these would be discussed later in this study. With Subhas Chandra Bose Patel's problem was different. For Patel the real issue with of Subhas Chandra Bose was that he did not accept the organisational discipline. Patel had a personal issue with Bose, but it can be said that this was not the reason for his dislike for Bose. On many occasions, both during the struggle for control over the Congress and and after Sadar considered Bose a patriot. If one takes into account how Sarat Bose, brother of Subhas Chandra Bose, and Sardar Patel cooperated later with mutual trust, it is obvious that Patel did not carry personal grudge against Bose and his associates. His differences were political and not personal.

During 1939 to 1942 the political developments has speeded up and particularly after the Government's decision to announce India' support for British without any consultation with the Congress leadership was a blow for Patel. There was a growing desire among the rank and file of the Congress workers that the Organisation should start a nationwide campaign against the British government. This was desired by Bose when he was the President, but then the situation

was not clear. But, now the Congress was completely wrong footed. In this delicate situation, Gandhi was in a difficult situation.

The growing challenge of Jinnah led Muslim League's campaign for Pakistan added another big challenge for the Congress. The attitude towards the British government was the key issue. When Gandhi was moving towards the decision of launching a movement he was solidly supported by Patel. As already mentioned there were many, including Jawaharlal Nehru, C. Rajgopalachari and Maulana Azad who were not convinced about the timing of launching the movement when the British were fighting against the Germany in Europe. But, Gandhi was supported by Patel. There is a view that Gandhi launched the movement with an understanding that the British side would lose the War. Sardar Patel and G. D. Birla, who were trusted by Gandhi, also had similar opinion. So, in the difficult situation for British, Gandhi thought the intent of Congress to launch a movement could make the British think differently. They were expected to listen to the Congress's suggestion of transferring the power to Indians. But, it was not to be. British crushed the 1942 Movements. In the volatile days of the Quit India Movement Patel was whole-heartedly with Gandhi.

In June 1945 Sardar Patel was released. He was by now clear that the British Imperialism was on its last legs internationally. He had been saying this repeatedly. To some other leaders also it was clear that the British wanted to leave India. In next two years time Patel worked for the fulfilment of the Misson of life -to free India.

The three sections the work has tried to follow the activities and his approach to the political developments of the last five years to argue that in the complex historical contexts of 1945 and 1950 it was Sardar Vallabhbhai Patel who laid the foundation of Modern India by first leading the Congress in the years leading to 'transfer of power' or independence, whichever way one looks at it, and then by doing the necessary maneuverings, sometimes with tactful and strictness, to unite India against many odds. He was a pragmatic deputy to a idealist Prime Minister magnitude of whose works could be understandable even to Nehru once he was gone. Sardar's role has been acknowledged by the then leaders, including Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru, but, unfortunately historians did not give him due recognition. He was misunderstood on many points and his differences with Gandhi and Nehru had sometimes been allowed to make a shadow on his role as a maker of independent India. This work is an attempt to see the acts and approach of Sardar Patel in the historical context to move in the direction of doing justice to his him. Many more works may be necessary in this direction.

বাংলা বিয়ের গান : হিন্দু ও মুসলমান নারী সমাজের ভূমিকা

বিয়ের গান বা বিবাহে সংগীত লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক বিবাহ সংগীত বলতে ঠিক কি বোঝায়? এর উত্তরে খুব সহজেই বলা যায় যে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিয়ের কয়েক দিন আগের থেকেই বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে যায়। পল্লীবাংলায় বাড়ির এবং আশেপাশের পল্লীবাসী বা গ্রামবাসী মেয়ে বউরা একত্রে মিলেমিশে বিজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ ৩/৫/৭/৯ জন এয়োতি মহিলারা বিভিন্ন স্ত্রীআচার পালন করার সময়ে সবাই একত্রে মিলেমিশে গান বাঁধেন। আর তাতে গলা মেলান বাড়ীর অন্যান্য সদস্য সদস্যরাও। তারা গান গাইতে গাইতে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই কাজগুলি সম্পাদন করে থাকেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গানবাজনার রীতি প্রচলিত আছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এবং এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেও। যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়েতে যে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়, যেখানে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় পরিবার আত্মীয় কুটুম্ব বা পাড়াপড়শী মহিলারা একত্রে মিলেমিশে নানা ধরনের নিয়ম-আচার পালন করেন (যাকে স্ত্রীআচার বলা হয়)। এই স্ত্রীআচার পালন করার সময় তারা মনের আনন্দে গান ধরে বসেন। একেই বলে বিয়ের গান। এই গানের ধারক ও বাহক মূলত মহিলা সমাজ। যুগ যুগ ধরে পরম্পরাগত ভাবে লোকের মুখে মুখে বাহিত হতে থেকেছে এই গান। স ঠিক সংরক্ষণের অভাবে হারিয়েও গেছে গান। আবার কিছু গান অযোগ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে বিকৃতও হয়েছে।

বিবাহ এমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যা কয়েকদিন ধরে চলে। বিভিন্ন পর্বে তার বিস্তৃতি। বহুরকম নিয়ম-কানুন, সংস্কার এর সঙ্গে জড়িত। বহু মানুষের সমাগম হয় একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে। আনন্দ-উচ্ছাস, হাসি-কান্না, ভালোলাগা-মন্দলাগা, সুখ-দুঃখ সবকিছু নিয়ে ভরপুর একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিয়ের অনুষ্ঠানের রীতিনীতিগুলোকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায়। ১) বৈদিক ও ২) লৌকিক।

বিবাহের একটি বিশেষ পর্ব যা শালগ্রাম শিলার উপস্থিতিতে পুরোহিত মহাশয়ের মন্ত্রচ্চারণের মাধ্যমে অগ্নিকে সাক্ষী করে অর্থাৎ যজ্ঞ করে কন্যাকে সম্প্রদান করা। কনের পিতা বা পিতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তাদের কন্যাকে পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন, তার গোত্রান্তর করেন। বর-কনে যজ্ঞকুণ্ডে চোদ্দবার/ সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। পুরোহিত মহাশয় বর কনের পরিধেয় বস্ত্রের থেকে খানিকটা অংশ বেছে নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেন , স্বামী তার স্ত্রীকে সিঁদুর পরিয়ে দেন এ সবই বৈদিক রীতির অন্তর্গত। বিয়ের অনুষ্ঠানে লৌকিক আচার অনুষ্ঠিত হয় বহুরকম। প্রথাগুলো শাখা, উপশাখা, বর্ণ ও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। এই প্রথাগুলি পালন করে থাকেন মূলতঃ বাড়ির মহিলারা। বৈদিক প্রথাগুলো সঙ্গে এর কোনোরকম যোগাযোগ নেই।

আচার অনুষ্ঠানের রীতিনীতি পালনে বিয়ের গান সহযোগে

মহিলাদের অংশগ্রহণ

হিন্দুদের বিয়ের গান:-

কিছুকাল পূর্বের গ্রামবাংলার চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি বিয়েবাড়িকে কেন্দ্র করে সেই বাড়ির মানুষজন, তাদের পাড়াপড়শি, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। এই প্রথা বা রেওয়াজ একসময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত জাতি ও উপজাতি সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই প্রথা ক্রমশঃ কমতে শুরু করে যখন থেকে মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হতে শুরু করে। কারণ শহর বা শহরতলীর মানুষের

কাছে আমোদ-প্রমোদের জন্য অনেকবেশী উপকরণ সহজলভ্য থাকে গ্রামের মানুষের তুলনায়। এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের সীমাবদ্ধতা অনেক বেশী। তাই বিয়ের দিন স্থির হলে, সেই দিন থেকে বিবাহ শেষ হয়ে জামাই মেয়ে দ্বিরাগমনে বাপেরবাড়ি আসা পর্যন্ত, বাড়ির মহিলারা নানা ধরনের স্ত্রী-আচার পালন করে থাকেন একত্রে ৩/৫/৭/৯ এই রকম বিজোড় সংখ্যায় একত্রিত হয়ে। আর এর প্রতিটি পর্বেই চলতে থাকে নানা রকম গান। এই গান মূলত মহিলারাই গেয়ে থাকেন। কখনো কখনো এই গানের সঙ্গে বাজনা হিসেবে ঢোলকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশীর ভাগ সময়েই মহিলাদের পাঁচমেশালি কণ্ঠের গীতই বিয়েবাড়িকে মাতিয়ে রাখে। হিন্দু রীতি অনুযায়ী দু-বাড়ির মধ্যে বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার পর সেই দিন থেকেই গানের আসর বসার রীতি আছে অনেক অঞ্চলে। দু-বাড়ির বড়রা অর্থাৎ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনেরা কথা বলে বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করার পর বাড়ির মেয়ে বউরা একে অপরকে পান-সুপারি-মিষ্টি খাইয়ে সবাই মিলে উলুধনি সহযোগে বিয়ের দিন ঘোষণা করা হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে একে বলা হয় পাটিপত্তর। আবার কোথাও বলা হয় লগ্নপত্র। তখন থেকেই বাড়ির মেয়ে বউরা আনন্দে মেতে ওঠেন আর গানও উঠে আসে তাদের কণ্ঠে।

গান:- দশরথ পিতা যার
নীতি করইন বিয়ার সাধ
পণ্ডিত পাঠাইন মিথিলা নগরে গো
রামের মা।।

বিয়েবাড়ির প্রয়োজনে ধানকোটা, চিরেকোটা, হলুদকোটা এগুলি ছিল অতি প্রয়োজনীয় কাজ। এই সময়ে তারা যে গান গাইতেন, তাঁর একটি উদাহরণ হল:-

“ও ধান ভানরে মুরলীর গীত শুনে
বৃন্দাবনে ভানে ধান রাই বিনোদিনী”।।

ঢেঁকিতে দ্রব্য চালিবার আগে ঢেঁকিকে বরণ করার রীতি আছে গানের মাধ্যমে। মহিলারা একত্রে এই রকম গান গেয়ে ঢেঁকিকে বরণ করে নেয়। গানের মধ্যেই বলা আছে কিভাবে কাজটা করতে হবে।

গান:- কুল বধু মিলে চলিতে কমলে, বিন্ধির বাড়ার সময় অতীত হইয়ে যায়।

চন্দন কাষ্ঠের ঢেঁকি যজ্ঞ ডোমের কিলা, সেই ঢেঁকিতে বান্ধে রামের/সীতার বিন্ধির বাড়।

তারা এইরকম সমস্ত গান গাইতে গাইতে ঢেঁকিতে পার দিয়ে ধানকোটা, চিড়েকোটা, হলুদকোটা ইত্যাদি কাজ করে চলতেন ঘন্টার পর ঘন্টা।

বিয়ের দিন ভোরবেলায় সূর্য উদয় হবার আগে পাত্র-পাত্রী দু-বাড়িতেই অধিবাস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র-পাত্রীকে ঘুম থেকে তুলে নতুন বস্ত্র পরিয়ে, ধান-দুর্বা মাথায় দিয়ে বাড়ির বড়রা আশীর্বাদ করেন এবং দই ও খইয়ের একটি মিশ্রণ তৈরী করে খাওয়ানো হয়। কারন এরপর সূর্য উঠে গেলে সারাদিন তাদের উপোষ করার রীতি বর্তমান। এখন অনেকেই এই নিয়মকে লঘু করে ফেলেছেন। কারন সারাদিন খাওয়া না হলে অনেক সময়ই পাত্র-পাত্রী দিনের শেষে অসুস্থ হয়ে পরার উপক্রম হয়। তাই অনেক বাড়িতেই দেখা যায় ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ এ নে পাত্র-পাত্রীকে খাইয়ে দেওয়া হয়। পাত্র-পাত্রী উভয়ের বাড়ি থেকে উভয়ের বাড়িতে অধিবাসের তত্ত্ব আসার এক রীতি আছে। অনেক জায়গায় একে তৈল কাপড়ও বলা হয়। তত্ত্ব থাকে পান-সুপারি, নানা ধরনের মিষ্টি, জামা কাপড় ইত্যাদি। তত্ত্ব নিয়ে যান গুরুজনেরা। তারা পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করেন সাধ্যমত অলংকার বা দামী জিনিষপত্র দিয়ে কারন এর মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখারও প্রয়াসও থাকে। এই তত্ত্ব পাঠানোর সময় যে গান পরিবেশন করা হয়-

দধি দধি কর মাগো দধি নাই মোর ঘরে, দধির লাইগ্যা পাঠাইয়াছি নলছড় বাজারে।

দধি লইয়া আসতে মাগো পথে পরল বাঁশ, ঘরের দধি দিয়া মাগো করাও অধিবাস।

বিয়ের দিন পাত্র-পাত্রী দু-বাড়িতেই সকালবেলায় বৃদ্ধি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুরোহিত মহাশয় এসে নানা উপাচারে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কিছু ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন। তাঁর জন্য নানা উপাচার গোছাতে হয়। একে চলতি কথায় অধিবাসও বলা হয়। এই সময়কার একটি গান হল:-

ওগো বৃদ্ধির কার্শে কী কী লাগে, ষোল মোন চাউল লাগে গো।

বিয়ের দিন সকালবেলা নদীর ঘাটে কিম্বা পুকুরে জল ভরতে যাওয়ার রীতি প্রায় সকলের মধ্যেই আছে এবং এটি একটি অত্যন্ত আনন্দের এবং জনপ্রিয় রিচুয়াল বা এই প্রথাকে কোথাও কোথাও অঞ্চল ভেদে বলা হয় “জল ভরতে যাওয়া” বা “জল সহিতে যাওয়া”। এই সময়ের গান হল:-

জলের ঘাটে দেইখ্যা আইলাম কি সুন্দর শ্যামরায়

শ্যামরায় ভ্রমরায় ঘুইরা ঘুইরা মধু খায়।।

অথবা

আইজ রামের অধিবাস, কাইল রামের বিয়া গো কমলা

আমরা জল ভরিতে যাই, সই আমরা জলে যাই।।

নদীর ঘাটে পৌছে, জল ভরার সময় অঞ্চলভেদে মহিলারা ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। তখনকার একটি গান হল:-

জলে চেউ দিওনা গো সখী

চেউ দিওনা, চেউ দিওনা,

আমরা জলের চাতকী।

জল ভরার কাজ সাঙ্গ করে তারা বাড়ি ফিরে আসেন এবং সেই জলের কলসী ও ঘট একটি শুদ্ধ স্থানে স্থাপন করেন। একে বলে মঙ্গলঘট স্থাপন করা। এই সময়কার একটি গান:-

ওগো মঙ্গল আসিছে দুয়ারে, মঙ্গলো অবনী আজ।

মঙ্গল জলধর, মঙ্গলো কলসে, পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে।

বিয়ে বাড়িতে গায়ে হলুদ মাখিয়ে পাত্র-পাত্রীকে স্নান করানোর প্রথাটি খুবই মজাদার একটি প্রথা। প্রথমে নিকট আত্মীয় এয়োতি মহিলারা বিজোড় সংখ্যায় একত্রে পাত্র বা পাত্রীর গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয়। এরপর সবাই সবাইকে হলুদ মাখিয়ে একটা মজার পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারপর ঐ মঙ্গলঘটের জল দিয়ে পাত্র বা পাত্রীকে স্নান করানো হয়। এই সময়ের গানকে বলা হয় গায়ে হলুদের গান। যেমন:-

রজনী প্রভাতকালে মহারাজা হুকুম করে, হলুদ আনতে হবে,

হলুদরে তোর জনম কোন খানে, আমার জনম জানতে গেরস্থের পালানে।

বরকে স্নানের গান:

কি করগো রামের মা গো, রান্না ঘরে থাকি, রামচন্দ্র দাঁড়াই আছে স্নানের লাগিয়া।।

বিয়ের দিন পাত্রকে হাত পায়ের নখ কামিয়ে, চুল-দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার রীতিও পালন করা হয়। এসময়ে যে গান হয় -

বাছা লাপিতেরে, বাছা লাপিতেরে, মোর বাছাক ভালো কইরা কামায়োরে।।

কোন কোন অঞ্চলে বিয়ের দিন নাপিতানিরা এসে মেয়েদের হাতে পায়ের নখ কেটে, হাত ও পা পরিষ্কার করে পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। যদিও এসব এখন ধরতে গেলে পুরোটাই অতীত। এসব কাজ এখন মেয়েরা বিয়ের দিনের আগে বিউটি পার্লারে গিয়েই করে আসে। তবে অতীতে এই কাজগুলি করতে করতে নাপিতানিরাও গান গাইতেন। যেমন:-

চল চল ওগো সখি আয়ানের পুরী।, শ্রীরাধাকে স্কোরী করইন মোহন বংশীধারী।।

মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজানোটাও একটা বিশেষ কাজ। সুন্দর করে চুল বেঁধে, গয়নাগাটি পরিয়ে, শাড়ি পড়িয়ে, চন্দন পরিয়ে, তারপর কন্যাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে তুলতে হয়। বাড়ির মহিলারা তখন কনে সাজানোর গান ধরেন:-

বিয়ার সাজোনি সাজো কন্যালো, বিয়ার সাজোনি সাজো।

আহা তুমার লাইগ্যা আনছে জহর-পান্না লো।।

অথবা,

সাজো সুন্দরী কইন্যা সাজো বিয়ার সাজে, মলিন কেন চানমুখখানি, মরো কেন লাঙ্গে।।

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কুঞ্জ সাজানোটাও একটা বিশেষ আনন্দের কাজ বিয়েবাড়িতে। বাড়িতে আগত আত্মীয়-কুটুম, পাড়া-প্রতিবেশীরা মিলে এই কাজে হাত লাগায়। বাড়ির উঠানে বা আশেপাশের কোন ফাঁকা জায়গায় যেখানে বিয়ের মূল অনুষ্ঠানটা হতে পারে আর সবাই মিলে জড়ো হয়ে সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে, সেখানে গোলাকার বা চৌকাকৃতির একটি জায়গা তৈরী করা হয়। তার মধ্যে চারটি কলাগাছকে সুতা দিয়ে বেঁধে একটি চারকোনা জায়গা তৈরী করা হয়। ফুল আমের পাতা রঙিন কাগজ এই ধরনের সব উপকরণ ব্যবহার করে ঐ জায়গাটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। এখানেই পা ত্র-পাত্রীকে নিয়ে এসে পুরোহিতমশাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের দিয়ে সব রীতিনীতি পালন করিয়ে, অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। এর সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক লৌকিক প্রথাও অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই হয় শুবদৃষ্টি, মালাবদল, সাতপাকে ঘোরা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু কুঞ্জ সাজানো গান হল-

আসবে শ্যাম কালিয়া, কুঞ্জ সাজাও গিয়া

এগো কেনোগো রাই কানতে আছো পাগলিনি হইয়া, কুঞ্জ সাজাও গিয়া।।

সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে করতে পাত্র এসে হাজির হলে পরে, পাত্রীর বাড়িতে পাত্রকে বরণ করে নেবার জন্য মহিলা মহলে হলুসুলু পরে যায়। তখন তারা যে ধরনের গান ধরেন তা হল:-

বিহার গাড়ি ঐ বুঝি আইসে, ঐ শোনা যায় আধা পথত বরখায় বাইজ পড়ে

কইন্যা কাইন্দো না কাইন্দো না কাইন্দো না ঘরে।।

এরপর বিয়ের আসরে পাত্র-পাত্রীকে নিয়ে এসে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই মূল অনুষ্ঠানটিতে অঞ্চল ভেদে, জাতি ভেদে নানা রকম নিয়ম কানুন লক্ষ্য করা যায়। চারি ধারে চারটি কলাগাছ রোপণ করে একটির সাথে অপরটিকে আমপাতা বাঁধা সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে বিয়ের বেদী তৈরী করা হয়। বর ও কনেকে একত্রে চোদ্দ পাক বা সাত পাক প্রদক্ষিণ করতে হয় সেই বেদীকে। সঙ্গে থাকেন কয়েকজন মহিলা এবং যথারীতি কিছু স্ত্রী-আচার ও গান:-

আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর, কলা তলায় বিয়া, আইলেন গো সুন্দরীর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।।

শুভদৃষ্টির গানঃ- হের গো সবে যুগল মিলন
কর সফল নয়ন

কন্যাদানের গানঃ- খাল দিলাম গ্লাস দিলাম
আর বা দিবাম কি

এখানকার পর্ব মিটে গেলে সকলে মিলে বর কনেকে ঘরে নিয়ে যায় এবং সেখানে পাটীতে বসিয়ে চলে নানা রকম খেলা। এই সময় কচিকাঁচার ব্যাস্ত থাকে এই সব খেলায়, আর বয়োজ্যেষ্ঠরা একত্রে মিলিত হয়ে গাইতে থাকেন পরের পর নানা রকম গান। যেমন:-

চলো সখী যমুনায়, বাঁশী ডাকে আয় আয়, দিনমণি ধীরে ধীরে যায়।
পাটীতে ঢালিয়া চাউল, রাখা করে আলো উজল, আইজ বুঝি শ্যামেরে হারায়।
আংটি খেলার গীত:-

চল চল নাগর বন্ধু জল খেলা খেলিতে
পুরুষ হইয়া নারীর সঙ্গে পারলেনা তুই আংটি খেলাইতে।
এরপর জামাই মেয়েকে খাওয়ানোর পালা। পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে সাধ্যমত শাশুড়ি মা তার জামাই ও মেয়েকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এসময়ের গান-

রাজার পালানি মাছ
জামাই ভোজনেরে, মাছ ইলিশরে

রাতে সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে নব দম্পতিকে নিয়ে বাসর ঘরে যায়। সেখানে চলে নানা রকমের রঙ্গরসিকতা, গান, নাচ, হৈ-হুল্লোর। এই আসরে মূলতঃ চলে হালকা বা চটুল রসিকতার গান। যেমন: -

তোমরা শনছো নিগো রাই, তোমরা শনছো নিগো রাই
কাইল যে আইসে নুয়া জামাই বলদ নাকি গাই।

বিয়ের পরের দিন বর-কনের বিদায় পর্বটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। এই দিন সকাল থেকেই বিয়ে বাড়ির আনন্দে, মূলতঃ কনের বাড়িতে কিছুটা ভাটা পরে। বিষাদের ছায়া নেমে আসে। জীবনের নানা ঘাত - প্রতিঘাত অতিক্রম করে একটি কন্যা সন্তানকে বড় করে তোলা, তাকে তাদের সাধ্যমত নানা শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজ সংসারের জন্য উপযুক্ত করে তোলার পর, সেই মেয়েকে নিজেদের কাছ থেকে বিদায় দিয়ে একটি সম্পূর্ণ অচেনা অজানা পরিবেশ-পরিবারের হাতে তুলে দিতে তাদের বুকটা ফেটে যায়। ফলত বিষাদের সুর বেজে ওঠে কনের বাড়িতে। বর কনের বিদায়ের অনুষ্ঠানটি কোথাও কোথাও সকালের দিকে অনুষ্ঠিত হয়। আবার কোথাও কোথাও দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরে বিকেলে বা সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা সকলেই বর কনেকে ধান-দুর্বা সহযোগে আশীর্বাদ করে জল-মিষ্টি খাইয়ে তাদের রওনা করিয়ে দেন। এই সময়ে খানিকটা কান্নাকাটির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে গান গাইবার রীতিও লক্ষণীয়।

যেমন-

কইন্যার মা তো করের কান্দন, কইন্যা কোলে লই
চোখের পানি পড়ি মায়ের বুক ভিজি যার গৈ

অপরদিকে বরের বাড়িতে আনন্দের ধূম পড়ে যায়। কারন বাড়িতে নতুন বৌয়ের আগমন ঘটবে। সকলে বরণ কুলো সাজিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন নতুন বৌএর আগমনের। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বর -বধু এলে তাদেরকে বরণ করে ঘরে তোলা হয়।

গান:- রামের মা বরণ করে হেলকে তুলে মাজা পড়ে,
কি বরণ করে লো, ও রামের সোহাগিনী।।

তারপর চলে নানা রকম স্ত্রী-আচার পালন, খেলাধুলা, আনন্দ-মস্করা ইত্যাদি। এসবের শেষে নব বধুকে তার জড়তা কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে একাত্ম করে তোলার জন্য তাকে নিয়ে 'গান বাজনার' অনুষ্ঠান শুরু হয়। সঙ্গে চলে প্রয়োজন মত 'নাচও'। সকলে মিলে একত্রিত হলে অনেক মানুষের সমাগম হয়, তাই গ্রাম বাংলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত বাড়ির উঠোনে সবাই মিলে জড়ো হয়ে, তাদের নব বধুকে মাঝখানে রেখে তাকে ঘিরে ধরে চলত নাচ গানের অনুষ্ঠান। চেষ্টা চলত তাকেও সামিল করে নেওয়ার। প্র থমে খানিকটা লজ্জা পেলেও, কিছু সময়ের পরে সেও তার সাধ্যমত কিছু করার চেষ্টা করতে বাধ্য হত। এই সময়ের কিছু গান-

সুহাগ চান বদনী ধনী নাচত দেখি
বালা নাচো চাইন দেখি, ভালা নাচো চাইন দেখি
বালা নাচত দেখি।।

আবার,
(আহা) ভালো কইর্যা বাজানরে দুতরা, সোন্দরী কমলা নাচে।।

নববধুর শ্বশুরবাড়িতে আসার পরের দিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ভাত-কাপড়ের অনুষ্ঠান। অর্থাৎ বর আনুষ্ঠানিক ভাবে, বাড়িতে উপস্থিত অভাগতদের সামনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে, সে সারা জীবন তার স্ত্রীর সবরকম দায়িত্বভার গ্রহন করবে। অপরপক্ষে নববধুও অঙ্গীকার করে যে, সেও তার শ্বশুরবাড়ির সকলকে সারা জীবন দেখে রাখবে ও সুখী করার চেষ্টা করবে তার সাধ্যমত। এই সময়ের গান-

নাগর, তুমি বিদেশে যাইও না। একলা ঘরে কইন্দা মরে সুন্দরী ললনা।।

ওই দিন রাতের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হল 'ফুলসজ্জা'। এই পর্বেও থাকে কিছু স্ত্রী-আচার। যেমন নববধু ডাবের জল দিয়ে তার স্বামীর পা ধুয়ে, নিজের মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে। তারপর একে অপরকে অঞ্চলভেদে কোথাও দুধ আবার কোথাও মিষ্টি খাইয়ে জল খাইয়ে দেবে। এরপর ফুল দিয়ে সাজানো ঘর এবং খাট - বিছানা তাদেরকে উপহার দেওয়া হয়। বর-বধু এই সময়ে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের বৈবাহিক নতুন জীবনে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পায়।

মুসলীম রীতি অনুযায়ী:-

হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও বিয়েতে মেয়েলী গীতের প্রচলন দেখা যায়। এদের বিয়েতেও নানা রকমের স্ত্রী-আচার লক্ষণীয়। পূর্বে এই স্ত্রী-আচার বিয়ের এক সপ্তাহ আগে শুরু হত এবং শেষ হত বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনে এবং তার সাথে ছিল দলবদ্ধ ভাবে নাচ, গান গাইবার চল। তবে বর্তমানে এই সময়সীমা অনেক কমে গেছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সমাজে পাশাপাশি অবস্থান হবার দরুণ উভয় সম্প্রদায়ের ওপর উভয়ের রীতিনীতি বা সাংস্কৃতিক চর্চার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে সেটা আদতে

কিরূপ ছিল বা কোন সম্প্রদায়ের মূল থেকে উঠে এসেছে এ নিয়েও দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে হিন্দু সমাজের বিয়ের গানে অনুসঙ্গ হিসেবে উঠে আসে রাম-সীতা, হর-গৌরী বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বা অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে উঠে আসে এইসব দেব-দেবীর নাম। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের গানে সাধারণত কোন রকম ধর্মীয় বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে না। তবে কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে অনুষ্ঠিত কিছু স্ত্রী-আচার যেমন- সিঁদুর খেলা, চাল খেলা ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়েতেও লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে সমাজের পণ্ডিতগণ বা মুকব্বিররা অনেকেই মনে করেন এখনকার অনেক মুসলমান পরিবার, যা বেশ কয়েক প্রজন্ম আগে হিন্দুই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নানা কারণে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই যে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি তারা একভাবে করতে অভ্যস্ত ছিলেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই থেকে গেছে। তাইতো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাংস্কৃতিক অবস্থান। তারা একে অপরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। একজনকে বাদ দিয়ে অপরকে সম্পূর্ণভাবে বোঝানো কঠিন হয়ে পরে। তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বিয়ের গানের প্রচলন ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। বহু জায়গায় এই গানের প্রচলন প্রায় লুপ্ত বা যেখানে প্রচলন আছে সেখানেও সঠিক মানুষের হৃদিস পাওয়া খুব কঠিন। আবার কোথাও কোথাও কিছু শিল্পী/মহিলা শিল্পী দেখা যায় যারা পেশাগত ভাবে এই গানের চর্চা করে থাকেন। রীতিমত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দল বেঁধে বিয়েবাড়িতে গিয়ে তারা সংগীত পরিবেশন করেন। এদের গীত গাউনি বলা হয়। সেক্ষেত্রে তাদের খানিকটা বাড়তি দায় থাকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার ব্যাপারে। ফলত পুরো বিষয়টি আরো খানিকটা রসমন্ডিত করার জন্য তারা গানের কথার বা সুরের কিছু পরিবর্তন করে ফেলেন। এইভাবে বহু গান তার নিজস্ব অবস্থান থেকে সরে গেছে। যদিও মুসলমান সমাজের একাংশের মতে সংগীত পরিবেশন নিষিদ্ধ বলেই মানা হয়, তথাপি দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক উৎসব- অনুষ্ঠানে বাড়ির অন্দর মহলের মহিলা সমাজ তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সংগীতকেই বেছে নেন। এ প্রথা তাদের আনন্দের অনুষ্ণ হিসেবে ও তথ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। নারীরা কখনোই পুরোহিত বা মৌলবী হতে পারে না। যদিও সাম্প্রতিক কালে হিন্দু সমাজে ‘মহিলা পুরোহিত’ বিষয়টি অনেকটাই গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠেছে বা উত্তোরোত্তর এদের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষত বিবাহের অনুষ্ঠানে ঘরোয়া রীতিনীতি পালনে যে স্ত্রী-আচার পালন করা হয় এবং তার সঙ্গে নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয় সেখানে একছত্র ভাবে নারীরই অধিকার, পুরুষের কোন অধিকার সেখানে থাকে না। নারীর ক ততুই সেখানে চুড়ান্ত। তবে মহিলারা যখনই একত্রিত হয়ে গানের আসর বসান, প্রথমেই তারা পীড়ের গান পরিবেশন করেন। এই গান করে প্রথমেই তারা পীড়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং এই গানের মধ্য দিয়ে আসরটাও জমে ওঠে। উদাহরণ-

তসরিয়া ঝাঁপা, তসরিয়া ঝাঁপা/ঝাঁপার খোলে খোলে লেখন রে

এবার মুসলমান সমাজের বিয়েতে অনুষ্ঠিত বিশেষ কয়েকটি রীতি আমার আলোচনায় উঠে আসবে, যার সাথে মেয়েলী গীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেলে পাত্র-পাত্রী উভয় বাড়িতেই যে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী হয়, তাতে বাড়ির ভাবী, নানী, দাদীর দল তাদের আদরের ধণকে নিয়ে নানা রকম গান বেঁধে আমোদ আহ্লাদে মেতে ওঠেন। যেমন-
পাত্রীপক্ষ বাড়ির গান:-

বালির বিয়ে ছুব না ছুব না বালি গো, চাষা জামাইকে-

জনম যাবে বালি গো, হাল- পাঁচন যুগাইতে।।

হিন্দুদের যেমন বিয়ের কয়েকদিন আগের থেকে পাত্র ও পাত্রীকে বিভিন্ন আত্মীয়, কুটুম্ব বা বন্ধু - বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষরা তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রন করে ভালো-মন্দ রান্না করে আইবুড়োভাত খাওয়ান, ঠিক সেই রকমই মুসলমান সমাজের রীতি পাত্র/পাত্রীকে খুবড়া বা খুবড়ো খাওয়ানো।

খুবড়া হল এক ধরনের মিষ্টান্ন, যা তৈরী হয় চাল, গুড়, দুধ দিয়ে। এরপর বিয়ে বা শাদীর দিনে পাত্র পাত্রী উভয়ের বাড়িতেই শেষ রাতে স্কীর খাওয়ানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির মহিলা মহলই মূলতঃ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে থাকেন। কোথাও কোথাও একে খুবড়ো খাওয়ানোও বলা হয়। মুসলমান সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে বর বা কনেকে বাড়ির গুরুজনেরা যখন আশীর্বাদ করেন, তখনই তারা খুবড়ো খাইয়ে থাকেন। এটি আশীর্বাদের একটি বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ। এই স্ত্রী-আচারটি পালন করতে করতে যে গাওয়া হয়:-

খালা ভরি ভরি স্কীরসা হে, আমার কোটরা ভরি ভরি দান,
খাওনা কেনে লওসা(বর) হে, তোমার নানী করিবে দান।।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। নানা রকম স্ত্রী-আচারে ভরপুর এই অনুষ্ঠান। এটি মূলতঃ তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। যেমন - 'খোঁয়াসী কূটা', 'ফুল হর ভরা', 'পাত্র হরিদ্রা'। টেকিতে হলুদের সঙ্গে কলাইয়ের খোসা, মেথি, চন্দনী, উপটন ও নাগর মাখা ইত্যাদি পেসাই করে, তাতে সরষের তেল মিশিয়ে বর-কনের মুখে-হাতে , গায়ে ভালো করে মাখিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি লোকবিশ্বাস কাজ করে যে, বর-কনের শ্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংসারেরও শ্রী বৃদ্ধি ঘটে। এই পর্বে মহিলাদের কণ্ঠে গীত হয়ঃ -

তেলের বাটি গামছা হাতে রে, হলুদ নিয়ে বাটিতে, হলুদের বাটি হাতে।।

মেয়ে বসল আলমতলাতেরে, মাও কানছে বাপো কানছে

পাত্র-পাত্রীকে স্নান করানোর জন্য জল সহিতে যাওয়াটাও বিয়েবাড়ির মহিলা মহলের কাছে একটা বিশেষ রীতি। বাড়ির মেয়ে বউরা দল বেঁধে গীত গাইতে গাইতে জল সহিতে যায়। রঙ্গ রসিকতায় ভরপুর এই সব গান।

আগাম জলে কলমি লতা, আমার আগামো ফুল ফোটে রে

আগামো ফুল তুলতে গেয়ে, আমার কলসী ডুবায়ে গেল রে।

এরপর স্নানের আগে হলুদ মাখানোর পালা। এই প্রথাটিতে বর/কনে উভয়ের বাড়িতেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বাড়ির সব সদস্য-সদস্যা, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলে অংশগ্রহন করে। এই সময় মহিলারা নানা রকম স্ত্রী-আচার পালন করে থাকেন। যদিও অঞ্চলভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। মহিলারা এইসময়ে আনন্দের প্রকাশে নানা রকম গান ধরেন। তবে প্রথমেই তারা আল্লা রসুল, পাঁচ পীড়, ও সমবেত গুরুজনের সালাম জানিয়ে এই কার্যটি শুরু করেন। তখন গান ধরেন:-

আজ বুঝি ছেলেলাল আমার তজ্জে বসেছে

এরপর ছেলেকে উঠোনের একপাশে ছোট জলচৌকির ওপর বসিয়ে বিজোড় সংখ্যায় এয়োতি মহিলারা মুখের সামনে একটা বড় পান বা কলাপাতার টুকরো আড়াল করে তার মাথায় 'উসুতেল' ঢালতে থাকেন। তারপর তার গায়ে হলুদ, আমলা, মেহেদী ইত্যাদি মাখানো হয়। আর মহিলারা সঙ্গে কুলো নিয়ে বরের চারিদিক প্রদক্ষিন করতে থাকেন। কুলোতে থাকে নানা সামগ্রী যেমন - চাল, ঘটি ভর্তি তেল, হলুদ, দুর্বো, কাঁচা হলুদ বাটা, কলাই, সর্ষে। নতুন গাছি সুতোর ধাগা। সঙ্গে চলে গান:-

ময়নামতির গায়ে হলুদ গিরাম দেখে আসি, বিয়ের সাজো না সাজো কন্যা লো

ঢাক বাজে মন্দিরা বাজে বাজে সানাই বাঁশি, ময়নামতির গায়ে হলুদ গিরাম দেখে আসি।।

বর কনেকে গোসল করানো বা স্নান করানো এটিও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিয়ের অনুষ্ঠানে। এই সময়েও গান গাওয়ার রীতি আছে। যেমন:-

পানি হাতে করে রে, ভাবে মনে মনে রে, কেবা আমায় গোসল করাইবে রে, কাঁহা নাকিন গেল রে।

গায়ে হলুদের পরে বর/কনের মা উপস্থিত গুরুজনদের কাছে ও আল্লা রসুলের কাছে নিজের সন্তানের জন্ম, যাতে তাদের ভবিষ্যত দাম্পত্য জীবন সুখের হয়, সেই কামনায় সোহাগ মাগতে যান। এই পর্বের গান :-

সোহাগ মানান তেলিরে

আল্লা রসুলকে সালাম রে রসোভা-

আর একটি বিশেষ পর্ব হল বর বরণ করা। বাদ্য বাজনা বাজিয়ে, বাজি পোড়াতে পোড়াতে, বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে বরের গাড়ি যখন কনের বাড়িতে পৌঁছায়, তখন হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও অন্দরমহলে মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে গান ধরেন-

নদীর কূলে কিসের বাজনা বাজেরে? সোনার ফাতেমারে।

অথবা,

অরুণ বরুণ কুলাখানি

বকুল ফুলের মালাগো, ভাইগো পতি বরণ কর।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বর কনের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন বর -কনেকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করে গীত গাউনিরা গান ধরেন-

চোল বাজে মন্দিরা বাজে, আর বাজে নহবৎ বালা হে।।

‘কন্যা বিদায় পর্ব’ এটিও স্ত্রী-আচারে ভরপুর। এই সময়ে পরিবেশ থাকে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মিশ্র অনুভূতিতে ভরা। মেয়েটি যে তার নতুন জীবনে পা রাখতে চলেছে এই বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে সকলে যেমন আনন্দ পান, তেমনি মেয়েটিকে কাছ ছাড়া করতেও তাদের মন ভেঙে যায়। আর মেয়েটিও তার একান্ত নিজের বলে জানা বা বেড়ে ওঠার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে এক অচেনা অজানা জগতে প্রবেশ করতে যায়। তাই সে একদিকে হারানো, অন্যদিকে নতুন কিছু পাওয়া সব মিলিয়ে ভয় -আনন্দ মেশানো এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকে। এসব চিত্রই ফুটে ওঠে কিছু গানে -

লাল লোটনের সুরঞ্জেরই ছটা মা

আমায় জলদি বিদায় দাও।।

কনেকে বিয়ের সাজে সাজানো এটা বিয়েবাড়িতে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। এই পর্যায়ের গানে হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গানই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

গান:- বুকু বুকু করিলে অন্তরে মোর বাঙ্কিয়া

না জানি মোর গৌরীপুরের হারে, নিরমল নিলায়না -

বধু-বরণ করা এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান পাত্রপঙ্কের বাড়িতে। এই সময় চলে নানা রকম স্ত্রী-আচার এবং রঙ্গ-রসিকতা, ব্যাঙ্গ-বিদ্রোপ সহকারে গান-

কুঠেকার(কোথাকার) হাঁস্যাকার(দীর্ঘকাল অভুক্ত) আইসাছে।

এককুলা ছাইয়ের লাইগ্যা বইস্যা আছে, তার মুখে ছাই তুইল্যা দে।

মুসলমান সমাজের মেয়েরা মূলতঃ পর্দানসীন, বাইরের জগতের সাথে মেলামেশায় অনেক বেশী রক্ষনশীল তারা। তাই বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে বিশেষত বিয়ের মতো অনুষ্ঠান, তখন বাড়ির অন্দরমহলে যে আনন্দের ঢেউ ওঠে তা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চান বাড়ির মহিলামহল। তারা নিজেরাই নানা রকম আচার নিয়ম তৈরী করেন যেখানে পুরুষের কোন ভূমিকা থাকে না, যেখানে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিয়ের শুরু থেকে শেষ অবধি চলে অফুরন্ত নাচ-গানের পর্ব। সুযোগ পেলেই তারা দল বেঁধে শুরু করেন গান ও প্রায়শই তার সঙ্গে চলে ঘরোয়া নাচ। কখনো কখনো এই সকল মজার অনুষ্ঠানে সামিল হন বাড়ির কিছু কিছু পুরুষেরাও। এই সব গানে যেমন থাকে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আবার কখনো কখনো প্রকাশিত হয় মহিলা মহলের নানা অভিজ্ঞতা, হতাশা, বেদনা। বিয়ের গানকে বিশ্লেষণ করলে তাতে কাব্যিকগুণ খুব একটা পরিলক্ষিত না হলেও তাতে থাকে সহজ সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ। ফুটে ওঠে তৎকালীন সমাজচিত্র, আর্থ -সামাজিক পরিকাঠামো, পারিবারিক চিত্র ইত্যাদি। এবারে কিছু গান সংকলিত হল যা বিভিন্ন সময়ে গাওয়া হয় কখনো ঢোলক বাজিয়ে এবং নৃত্য সহযোগে।

গান:- ১) ছায়া ঢোলক বাজায়ছে, গোরি নাচে কদমতলাতে।

গোরির মাথার টায়রা মাথায় মানাছে, গোরি নাচে কদমতলাতে।।

২) ছিমছাম তুলিতে গেলাম নাচিতে হে শ্যাম, কোলে ঘুমাইল জাদু হে শ্যাম ।।

৩) অরুণ বনে বাজছে বাঁশি, চল শ্যাম দেখে আসি। বাঁশির সুরে মন মানে না রে

আদিবাসী জনজীবনে বিয়ের গান :-

তামাং জনজীবনের বিয়ের গানঃ- বিয়ের পর বর-বধূকে আশীর্বাদ করার সময় গাওয়া গান:-

মাত্রে ডাকে খুইয়ু রাং, ভগুন চুরগুন নামে রাং

খুগ তাওয়ার খুইয়ু রাং, দুপ্পুর কুমড়া নামে রাং.....

ভাবার্থ: হিমালয়ের সব পাখিরা যেমন প্রেম ভালোবাসা সহকারে জোর বেঁধে থাকে- সেই রকম তোমারাও চিরকাল অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন একসঙ্গে সুখে থাকবে এটাই আমাদের কামনা।

লিম্বু জনজীবনে বিয়ের গানঃ- সিঁদুর দানের সময় গাওয়া গান:-

নিহারো হংসিং-কে সাহারে, থকলাগেন পুবুং মেন লাদতে

শেষেনু পাবো ইয়ং লারো বাং, নিহারো হংসিং-কে সাহারে.....

ভাবার্থ: লিম্বুরা নানা রকম বাজনা বাজিয়ে নব বর-বঁধুকে আশীর্বাদ করেন, যেন তারা তাদের বিবাহিত জীবন ভালভাবে কাটাতে পারে, সারা জীবন যেন একসঙ্গে থাকতে পারে।

মুন্ডা জীবনে বিয়ের গানঃ- বরের বিয়ে করতে যাওয়ার সময়ের গান:-

সোবেন কো জুতা লাল পিয়ার , বাবুরা জুতা সাদারে \ বাবু সেলো তালায় শশুরাল , বাবু ভাইয়া

জুতা পিট সেনো জানাই বাবু, জুতা নাম কেদাম রে \ বাবু সেলো তালায় শশুরাল, বাবু ভাইয়া।

ভাবার্থ: সকলের জুতার রঙ লাল তবে বরের জুতার রঙ সাদা, বর শশুরবাড়ি যাচ্ছে। জুতা যেখানে পাওয়া যায় সেই বাজারে গিয়ে জুতা পাওয়া গেছে, বর শশুরবাড়ি যাচ্ছে, বর ভাইয়া।।

মাহাতোদের গানঃ-

১) ছাদনা তলায় পাওয়া হয়-

গাছের বেগুন তুলনা মা , গাছে হবে সুধা(ফাঁকা),
কোলের বিটি বিকোনা বাবা , কোলও হবে সুধা গো।
বিকোনা বিকোনা বাবা , আমি ঘরের শোভা ছিলি গো।।

ভাবার্থ:- বেগুন গাছ থেকে বেগুন অর্থাৎ ফলন্ত গাছ থেকে যদি ফলকে তুলে ফেলা হয় তখন যেমন সেই গাছটি ফাঁকা হয়ে যায়, ঠিক সেই রকমই বাড়ির মেয়েকে (কোলের বিটি) বিয়ে দিয়ে দিলে সেই বাড়িও ফাঁকা হয়ে যায়। কারণ এই মেয়েই হল ঘরের শোভা।

২) বিদায়ের গান-

কোন বনের লতা-পাতা, কোন বনের পাতা গো
কোন বনে হারালি নুনি(পাত্তী), সোনার কাজললতা গো
কাজললতা খুঁজতে খুঁজতে , নুনির জল তৃষা লাগে গো
সাগরকার কুলির মুড়হায়(গ্রামের শেষ প্রান্ত) , জল নাহি মিলে গো।।

ভাবার্থ:- বিয়ের পর নতুন কনে যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, তখন সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সে বা তার বাড়ির লোকেরা অনেকক্ষেত্রে একেবারেই অবগত থাকেনা। মেয়েটি যেখানে যাচ্ছে সেখানকার মানুষজন কেমন বা মেয়েটি সেখানে আদৌ ভালো থাকবে কিনা- এই বিষয়ের ওপর রচিত এই গান।

৩) বর বিয়ে করতে এলে তাকে গালি দিয়ে গান-

ক)টুপা সুকু নিয়ে নুনি, কুলি ধারে ভরাইলো
বাড়ির ধারে ঘুরে আইসো নুনি, তোমার জ্যাঠা খরদ্যার(বরের বাবা) বসাইঞ্জো।

ভাবার্থ:- বর যখন পাত্তীর বাড়িতে বিয়ে করতে আসে, তখন কনের বাড়ির লোকজন মজার ছলে বর ও তার বাড়ির লোকজনকে নানা রকম গালি গালাজ করে। এর উদ্দেশ্য একটাই রঙ্গ-রসিকতা করা। এখানে তাই বরের বাবাকে 'খরদ্যার' বলা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এটি গালির সমতুল্য।

খ) খুদি খাইয়ে মেলখু জোগায়, সেকি গো বড় ধনী মান
গামছা বিছায়ে টাকা খুঁজে , আমায় লাগে অপমান।

ভাবার্থ:- এখানে বর ও বরপক্ষকে ভীষনভাবে অপমান করা হয়েছে। গানটিতে বর চালের খুঁদ খেয়ে অর্থাৎ কিপটেমো করে, বড় বড় কথা বলে। আবার গামছা বিছিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা চায় এবং সেটা দেখে পাত্রীর বাড়ির লোক ভীষন অপমান বোধ করে।

৪) বিদায়ের গান-

বড় বান্দে আদে যেতে নুনি, পায়ের আলতা গো ভালো না
পায়ের আলতা নয়ন তারা, সঙ্গীর মন কাঁদায়ো না।

ভাবার্থ:- বিয়ের পর বিদায়ের সময় পাত্রীর বাড়ির লোকজন(বিশেষত মহিলারা) ভারাক্রান্ত মনে তাদের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির সকলকে নিয়ে সুখে থাকার জন্য কিছু উপদেশ দেন। সেই বিষয়টিই এই গানে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

রাজবংশীদের বিয়ের আচার:-

১) বরণ বরে চাইলন চায়
উয়ার নাকের নোলোক্যান ঢুল খেলায়..... ।

২) দ্বৈত সংগীত:-

স্ত্রী:- ও মুই কপাল মাঞ্জিয়া রে, আছং বসিয়া রে, সিন্দুর নিয়া ক্যানো আসিলেন না
পেন্দাবার চায়া পেন্দাইলেন না (তোমরা)।।

এছাড়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে উপলক্ষে বিয়ের আগের দিন সাইটর বিষহরি পূজার চল আছে। এই সময়ের গান: -

১)ফুল ধরো ফুল ধরো মাইলানি, ফুলবা করো হাতে , তার আগে ছিটাও ফুল ধরন ঠাকুরের আগে।।
২)ওমা মণষা কি ফুলে সেবিবরে রাঙ্গা চরণ , ফুল দিয়া না তোক সেবিনু রে হয়।

লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারে এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে বিয়ের গান। প্রাচীনকালে বিনোদনের জন্য এখনকার মত এত উপাদান ছিল না বলেই বাড়ির অন্দরমহলে সকলে মিলে কাজ করতে করতে গান গাওয়াটাই ছিল বিনোদনের একমাত্র এবং সহজ উপায়। মহিলারা সকলে মিলে আনন্দ করে মুখে মুখে গান বাঁধতেন এবং মনের আনন্দে গাইতেন সে গান। সে সময়ে ঐ সকল গানকে সংরক্ষণ করার বিশেষ উপায় ছিল না বা তারা এই ব্যাপারে কোন তাগিদ হয়তো অনুভব করেননি। তাই বহু গান সৃষ্টি হতে হতেই হারিয়ে গেছে। আবার কিছু গান বংশ পরম্পরায় বাহিত হতে হতে সামনের দিকে ধাবিত হয়েছে আর এই বিষয়টি পুরোটাই শ্রুতি নির্ভর হওয়ার জন্য কম বেশী কিছু কিছু পরিবর্তনও হতে থেকেছে বার বার। আমার এই কাজটির মূখ্য উদ্দেশ্যই হল এই অমূল্য সম্পদ গানগুলিকে যথাযত ভাবে সংরক্ষণ করা। তাই মূল কাজটিতে স্বরলিপির মাধ্যমে প্রায় আশিটি গানের স্বরলিপি যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি পরবর্তী সময়ে গবেষনার কাজে আমার এই কাজটির মাধ্যমে অনেকেই উপকৃত হবেন।।

**Final Report of University Research Project in Bengali
(2023-2024)**

একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা

Bengali Drama and the Theater Performences in 21st Century



Submitted by

Dr. Subrata Mondal

Associate Professor

Department of Bengali

Principal Investigator, URP(2023-2024)

Rabindra Bharati University

56A, B.T. Road

Kolkata - 700050

নিবেদন

নাটক পড়া ও থিয়েটার দেখা ভালোলাগা থেকে। এ বিষয়ে একটা গবেষণা করার ইচ্ছা দীর্ঘদিনের। ২০১৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী, আমরা যারা তখন যোগদান করেছিলাম তাদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট (URP) নেওয়ার কথা বলেছিলেন। ঠিক তখন থেকেই নাটক ও থিয়েটার নিয়ে কাজ করার ইচ্ছাটা বেড়ে যায়। তারপর ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রকল্পের জন্য যখন বিজ্ঞপ্তি বেরোয় তখন ‘একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা’ শিরোনামের বিষয় নিয়ে আবেদন করি ও নির্বাচিত হই। এই জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন দু’জন উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী ও অধ্যাপক নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়কে। কৃতজ্ঞতা জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব ড. আশিস কুমার সামন্তকে। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য ও কলা-অনুষদের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক স্নাতী ঘোষ মহাশয়কে। কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী উজ্জ্বলকুমার বসুমাতা মহাশয়কে। তিনি নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন গবেষণার কাজকে সঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে। কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান বিত্ত আধিকারিক শ্রী দেবদত্ত রায় ও ড. প্রদীপ্ত কুণ্ডু মহাশয়কে।

গবেষণা প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে যাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে গবেষণার অভিমুখকে ধরে দিয়েছেন তাঁরা হলেন- অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক শান্তনু দাস ও অধ্যাপক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অভিজিত কুমার মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নাট্যশোধ সংস্থান, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রভৃতির আধিকারিকদের ও যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

আমার এই গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প-সহায়ক শ্রী মুকেশ হালদার ছাড়াও যারা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে - শ্রী বাপি দাস, শ্রী সৌত্রিক ঘোষাল, সুস্মিতা বিশ্বাস, শ্রী নীলাঞ্জন হালদার, শ্রী সুদীপ্ত সাহা, শ্রী লিঙ্কন দাস প্রমুখ। এদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বর্তমানের ভোগবাদ সর্বস্ব প্রাত্যহিকতায় সুস্থ-সাংস্কৃতিক চর্চা বিপন্নপ্রায়। যেখানে যতটুকু সেই প্রয়াস চলছে, সেখানেও তাকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। পারিপার্শ্বিক এই প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও যাঁরা নিরন্তর টিকিয়ে রেখেছেন সেই নাটক ও নাট্যচর্চাকে তাঁদেরও শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই তাঁদেরকে যাঁরা তথ্য দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে সাহায্য করেছেন। ‘একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা’ শীর্ষক গবেষণায় চেষ্টা করেছি এই সময়ের নাটক ও নাট্যচর্চার

ক্ষেত্রকে একটি পরিসরে ধরতে। এই বিস্তৃত পরিসরকে ধরার চেপ্টার মধ্যেও যে সীমাবদ্ধতা আছে, অসম্পূর্ণতা আছে তা স্বীকার করি। আশাকরি পরবর্তী কোন গবেষণায় সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি একটি পূর্ণতার পথ পাবে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা	
ভূমিকা :	৫ - ৯	
প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতক ও বাংলা নাটক	১০ - ২১	
দ্বিতীয় অধ্যায় : বিশ শতক ও বাংলা নাটক	২২ - ৪৩	
তৃতীয় অধ্যায় : একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার অভিমুখ	৪৪ - ৭৭	
ক. বিশ্বায়ন ও বাংলা নাটক		
খ. থিয়েটারে রাজনীতির প্রসঙ্গ		
গ. ছোটোদের থিয়েটার		
ঘ. বাংলা নাট্যচর্চায় চেতনা ও তার বিবর্তন		
ঙ. নৃত্য ও নাট্যের পরিকল্পনা : অলকানন্দা রায়		
চ. ব্লাইন্ডদের থিয়েটার—থিয়েটারে ব্লাইন্ডরা		
ছ. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার		
চতুর্থ অধ্যায় : একুশ শতকের নাটককার ও বাংলা নাটক	৭৮ - ১১৪	
পঞ্চম অধ্যায় : একুশ শতকের থিয়েটারে মহিলা পরিচালক	১১৫ - ১৩২	
ষষ্ঠ অধ্যায় : একুশ শতকের থিয়েটারের নেপথ্যে -	১৩৩ - ১৬০	
ক. দৃশ্যপট ও মঞ্চনির্মাণ		
খ. আলোকচিত্রণ		
গ. শব্দ পরিকল্পনা—আবহ-সংগীত অনুষ্ঙ্গ		
উপসংহার :	১৬১ - ১৬৪	
গ্রন্থপঞ্জি :	১৬৫ - ১৭০	
পরিশিষ্ট : ১	জেলাভিত্তিক নাট্যচর্চার ধারা (সাক্ষাৎকারধর্মী)	১৭১ - ২৪২
পরিশিষ্ট : ২	নাট্যদৃশ্য ও নাট্যচর্চার বিভিন্ন চিত্র	২৪৩ - ২৬১

ভূমিকা :

বাংলা নাটক ও নাট্য চর্চার ইতিহাস ২০০ বছরের পুরনো হলেও প্রথাগতভাবে বাঙালির বাংলা নাট্যচর্চার সূচনা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। উনিশ শতক থেকে একুশ শতকে, সমাজ জীবনের নানা সমস্যার, প্রথার, মানসিকতার বিবর্তমান রূপের প্রতিফলনই গবেষণার বিষয়।

একুশ শতকের বাংলা নাটক ও তার মঞ্চায়নে সমকালের স্রোত মিলেছে। পুরাতনের অপ্রয়োজনীয় অংশকে ভেঙেচুরে ইতিহাস যেমন এগিয়ে চলেছে, সাহিত্যের আধুনিকতাও চলেছে। একুশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ যেমন সময়ের সঙ্গে তার পথ বদলে নিয়েছে, তেমনই এই সময়ের নাটককাররা তাদের নাটকে বিষয় ভাবনায় অভিনবত্বের পাশাপাশি তাঁর প্রায়োগিক দিককেও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। যেমন- মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, চন্দন সেন, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বণিক, তীর্থঙ্কর চন্দ, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভি চক্রবর্তী, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চন্দন সেনের ‘দুই হুজুরের গল্প’, অশোক মুখোপাধ্যায়ের ‘বেলা অবেলার গল্প’ প্রভৃতিতে পলিটিকাল আন্ডারটোন আছে।

একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্য চর্চার পরিধি সময়ের নিরিখে ২২ বছরের। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের বিস্তার ও বৈচিত্র্য অনেক। যদিও একুশ শতকের নাটক চর্চার গতি ও বৈচিত্র্যকে শুধুমাত্র একটি সময়ের সীমারেখা দিয়ে ব্যাবছিন্ন করা যায় না। গতিশীলতা সাহিত্যের ধর্ম। তাই একটা শতাব্দীর প্রবহমান মেজাজ ও ধর্ম পরবর্তীকালের মধ্যে সঞ্চারিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে নাটক এখনই স্বতন্ত্র যে একটি নাটকের নাট্যরস তখনই প্রকাশ পায় যখন তা মঞ্চাভিনয়ের নিষ্পন্ন হয়। আর যখন মঞ্চে অভিনীত হয়, তখন মূল নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় পরিচালক, অভিনেতা ও মঞ্চ ভাবনার নানা দিক।

এই সময়ের বিশিষ্ট নাটককারদের মধ্যে একজন ইন্দ্ৰাশিস লাহিড়ী। তাঁর ‘ইচ্ছেগাড়ি’র সফলতা তাঁকে নাটককার হিসেবে পরিণত করে তোলে। ‘চেনামুখ’ এ ইন্দ্ৰাশিসকে আমরা তিন ভূমিকায় পাই – নাটককার ছাড়াও অভিনেতা ও যুগ্ম নির্দেশক। ‘দৃষ্টিকন্যা’ সহ প্রায় প্রতিটি নাটকে ইন্দ্ৰাশিস গড়ে তুলেছেন সম্পর্কের নানা দিক। ইন্দ্ৰাশিস লাহিড়ীর অন্যান্য নাটকের মধ্যে – ‘লজ্জাতীর্থ’, ‘সাঁঝবেলা’, ‘পঙ্কিবুলি’ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

তারপর একুশ শতকে যারা বাংলা নাটক ও নাট্যক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কাণ্ডারি তাঁদের মধ্যে অরুণ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বণিক, অশোক মুখোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, তীর্থঙ্কর চন্দ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, অধিকারি কৌশিক, কৌশিক কর, সুভাসিক খামারু প্রমুখ।

একুশ শতকের নাটক চর্চার ধারাকে যারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের বলিষ্ঠ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, তাঁরা হলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবশঙ্কর হালদার, গৌতম হালদার, সোহিনী সেনগুপ্ত, ব্রাত্য

বসু, কৌশিক সেন, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, উষা গাঙ্গুলি, সীমা মুখোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, শাঁওলী মিত্র, জয়তি বোস, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, অর্পিতা ঘোষ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। একুশ শতকের বাংলা নাটক চর্চার অভিমুখকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিভিন্ন নাট্যদলও। সায়ক, নান্দীকার, নান্দীমুখ, বারাসাত কাল্পিক, সুন্দরম, শূদ্রক, পঞ্চম বৈদিক, অশোকনগর নাট্যআনন, শ্যামবাজার নাট্যচর্চা, সোনারপুর উদ্দালক প্রভৃতি শহর ও শহরতলির নাট্যদল।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতক ও বাংলা নাটক

উনিশ শতকে এই যে এক পরিবর্তনের আবহাওয়া তথা নতুন ভাবনা-চিন্তা সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারলেন না বাঙালি নাটককারেরাও। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই নাটককাররা নিজের সমাজের নানাবিধ সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নাটক রচনা করলেন। বলা যায়, যুক্তিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মন এই সমস্যাগুলির দিকে তাঁদের চোখ ফেরাতে বাধ্য করল। রামনারায়ণ তর্করত্নের ১৮৫৪ সালে লেখা প্রথম নাটক ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ কৌলিন্য প্রথাকে আঘাত করেই লেখা অস্বিকাচরণ বসুর ‘কুলীন কায়স্থ নাটক’ (১৮৬১); তাছাড়া রামচন্দ্র দত্তের ‘বাল্যবিবাহ’ নাটকেও এই প্রথা সম্পর্কে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত। অমৃতলাল বসু লিখেছেন ‘সম্মতি সংবাদ’(১৮৯১) প্রহসনটি। আসলে বিবাহিতা কোনো নারীরসহবাসের বয়স নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে কনসেন্ট বিল আনা হয়েছিল। এই বিলের বিরুদ্ধেই অমৃতলাল বসুর এই প্রহসন সৃষ্টি। এই একই বিষয় নিয়ে ১৮৯১ সালে ‘আইন বিদ্রাট’ নামেও একটি নাটক রচনা করেন হরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমকালীন বাঙালি নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিল। ১৮৫৬ সালে লেখা উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবাবিবাহ নাটক’ এই আন্দোলনের প্রতি নাটককারের পক্ষপাতিত্বকে স্পষ্ট করে। এছাড়া রাধামাধব মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘দলভঞ্জন’, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিবাহোদ্ধাহ’ প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু পুনরুত্থানের সময়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমাজের রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। এই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর কিছু নাটক ও প্রহসনে বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীদের প্রতি নানা ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নাটককাররা সময়ের দাবিকে মেনে নিয়েই নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সপত্নী সমস্যাও উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৫২ সালে রচিত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে সতীন পুত্রের প্রতি সৎমায়ের অত্যাচার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘উভয় সংকট’(১৮৬৯) নামক প্রহসনেও সেই সপত্নী নিয়ে সমস্যার কথা, যা খানিক হাস্যরসের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের ‘জামাই বারিক’ প্রহসনটি মূলত ঘরজামাইকে কেন্দ্র করে রচিত।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গড়ে উঠেছিল বাবু সম্প্রদায়। মদ্যাসক্তি ও নৈতিক শৈথিল্য ছিল তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে শতাব্দীর একাধিক নাট্যকার এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেছেন। প্রথমেই মনে পড়বে প্যারীচাঁদ মিত্রের ১৮৫৯ সালে

লেখা 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নাটকটির কথা। তাছাড়া রাখামাধব হালদারের 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৯৩), অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'সাদা ও আমি' (১৯০৩), কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'গোলকধাঁধা' (১৮৮২) এসব প্রহসনেও বারান্ধনা আসক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকাররা।

পণপ্রথাকে কেন্দ্র করেও বিরোধিতার বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল এই শতকে। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'কন্যাদায়' নাটক ও 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' প্রহসনে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার। তাছাড়া গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' (১৯০৫) নাটকে কন্যাদায়গ্রন্থ পিতার পণ দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে দুরবস্থা, তা উঠে এসেছে অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট', যতীন্দ্রনাথ শর্মার 'কন্যাদায়', 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র', 'পাশ করা জামাই' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন যেমন তার যাত্রা শুরু করেছিল, তেমনি সেই যাত্রাপথে রক্ষণশীল বাঙালিদের বাধাও ছিল সুপ্রচুর। অমৃতলাল বসু এই নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে বিদ্রুপ করে লিখেছেন 'বৌমা', 'কালাপানি', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রভৃতি একাধিক নাটক ও প্রহসন। তাছাড়া রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন জেনানা' ও অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কলিরহাট' প্রহসনেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশস্বাভাব্যবোধ, জাতীয়তাবোধ জাগরিত হচ্ছে নতুন শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে, যা বিশ শতকে এসে আরও সংহত ও সংগঠিত হয়েছে।

উনিশ শতকের পাঁচের দশকে যখন একদিকে সমাজসংস্কার ও নির্মীয়মান জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রাধান্য পাচ্ছে, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় যাত্রার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে পাশ্চাত্যের নাটকের সংরূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে বাঙালি সমাজ; তখনও ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনি নিয়েকিছু পৌরাণিক নাটকলেখা হয়েছে।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মূলত সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন। তবুও সত্তার গভীরে নিহিত ধর্মীয়চেতনার প্রভাবে মৌলিক পৌরাণিক নাটকও সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে-'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৩), 'ধর্মবিজয়'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনমোহন বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়রা ছাড়াও রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখরা বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাটিকে পুষ্টি করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়েরনাটকে মনমোহন ও গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যরীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। 'তরণীসেন বধ', 'ভীষ্মের শরসজ্জা', 'হরধনুভঙ্গ', 'দুর্বাসার পরান', 'যদুবংশ ধ্বংস', 'রামের বনবাস', 'তারক সংহার' প্রভৃতি রাজকৃষ্ণ রায়ের উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতক ও বাংলা নাটক

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের নাটকের প্রবণতায় ভর করে যে বিশ শতকের নাটকের ক্ষেত্র নির্মিত তা বলাইবাছল্য। যেমন উনিশ শতকের দুই বিশিষ্ট নাটককার—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৬)-এর কিছু নাটক দুই শতাব্দীর সেতুবন্ধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। একই সঙ্গে এদের কিছু নাটকে যেমন উনিশ শতকীয় যুগচিহ্ন থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নতুন ভাষ্য হয়ে উঠেছে। আবার কিছু নাটক বিশ শতকে রচিত হলেও যেমন—দ্বিজেন্দ্রলালের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২) বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘সপ্তম প্রতিমা’ (১৯০২) ও ‘সাবিত্রী’ (১৩০৯)-এ নতুন শতাব্দীর কোনো যুগলক্ষণও ধরা পড়ে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা নাটকের মধ্যে দুটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ করা যায় — প্রথমত, পৌরাণিকতা ও দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকতা। সঙ্গে সামাজিক আবেদন কিন্তু বিশ শতকের শুরুতেও রাজনীতি, স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিত থাকলেও আগের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা রঙ্গালয়গুলির উজ্জীবন ঘটে মূলত বঙ্গভঙ্গের আবহে ও স্বদেশি ভাবধারায় নাটক রচনায়। যেমন এই পর্বে গিরিশ ঘোষের ‘সিরাজদৌল্লা (১৩১২), ‘মীরকাসিম’ (১৩১৩), ‘ছত্রপতি শিবাজী’ (১৩১৪), অমৃতলাল বসুর ‘নবজীবন’ (১৩০৮) ও ‘সাবাস বাঙালি’; দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ শতকের নাটকের পটভূমি মূলত স্বদেশি আন্দোলনের ভিত্তিতেই রচিত। দেশপ্রেমের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস উঠে এসেছে তাঁর নাটকে—‘প্রতাপ সিংহ’ (১৩১২), ‘দুর্গাদাস’ (১৩১৩), ‘নুরজাহান’ (১৩১৪), ‘মেবার পতন’, (১৩১৫), ‘সাজাহান’ (১৩১৬), ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৩১২) প্রভৃতি নাটকে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই পর্বে রচনা করলেন—‘প্রতাপাদিত্য’ (১৩১৩), ‘পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত’ (১৩১৩), ‘নন্দকুমার’ (১৩১৪), ‘বাংলার মসনদ’ (১৩১৩)। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন বঙ্গের ‘অঙ্গচ্ছেদ’ (১৯০৫), সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গালী পল্টন’ (১৯১৬) প্রভৃতি নাটক। বিশ শতকের অন্যতম কয়েকজন বিশিষ্ট নাটককার—শচীন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬১), মন্মথ রায় (১৯০০-১৯৮৮), ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিকান্ত বসুরায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মনমোহন রায় প্রমুখ। এছাড়া অন্যতম দুজন নাটককার ও নাট্য ব্যক্তিত্ব অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) ও অনাজন যোগেশ চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪১)। অপরেশচন্দ্রের নাটকের মূল উপজীব্য পৌরাণিকতা ও ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ। যেমন তাঁর বিখ্যাত কিছু নাটক—‘রাখীবন্ধন’, ‘অযোধ্যার বেগম’, ‘চণ্ডীদাস’, ‘কর্নাজুন’, ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ইত্যাদি। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পৌরাণিক নাটক ‘সীতা’। এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কল্লোলের বাস্তব ঔৎসুক্যের আদর্শেও নাটক রচিত হয়েছে। যেমন বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘মাটির ঘর’, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘ঝড়ের রাতে’ ও ‘তটিনীর বিচার’ প্রভৃতি নাটকে সমকালীন বাস্তব হয়ে উঠেছে। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়াও বিশ শতকের ব্যতিক্রমী ধারার নাটককারদের মধ্যে বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর জীবনী নাটক রচনা ও কিছু হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা কৃতিত্বের দাবি রাখে। যেমন জীবনীনাট্য — ‘শ্রীমধুসূদন’,

‘বিদ্যাসাগর’ দুই যুগ চিহ্নিত পুরুষকারের জীবনের স্বতন্ত্র পাঠ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৯৬-১৯৩২) ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ (১৯৩২) বাংলা নাটকের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নাটক।

বিশ শতকের নাটক ও নাট্য প্রকরণের অন্যতম সংযোজন রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যকলার বিকল্পধারা। একদিকে তাঁর নাটকের বিষয় ও আখ্যান বিন্যাসে সমকালের প্রথাগত নাটকের থেকে সরে এসে নাট্য প্রকরণে বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন। প্রথম পর্বের গীতিনাট্য—‘বাল্মীকি প্রতিভা’, ‘মায়ার খেলা’ নাটকে সংগীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। একপ্রকার সুরের দ্বারা নাটকের আখ্যানবস্তুকে অভিনয় সম্ভাবনায় ফুটিয়ে

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক বিন্যাসে ক্রমাশয়ে—কাব্যনাট্য, রূপক সাংকেতিক নাটক, যেখানে ভাব ও তত্ত্বপ্রাধান্যমূলক নাটক। সামাজিক নাটক, কৌতুক নাটক ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের কাছে পরমাশ্চর্যের। কাব্যনাট্যগুলি যেমন—‘চিত্রাঙ্গদা’ (১২৯৯), ‘বিদায় অভিশাপ’ (১৩০১), ‘গান্ধারীর আবেদন’ (১৩০৫), ‘সতী’ (১৩০৪), ‘নরকবাস’ (১৩০৪) প্রভৃতিতে আকার নাটকের হলেও এর অন্তর্গত একটা সংগীতময়তা আছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ট্রাজেডিগুলির মধ্যে ‘রাজা ও রানী’, ‘বিসর্জন’, ‘মালিনী’ প্রভৃতি নাটকের লিরিকের প্রাধান্য থাকলেও ভাব ও তত্ত্বকে তিনি পরোক্ষে প্রাধান্য দিয়ে নাটকে অবর্ণনীয় রসের সঞ্চয় ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্বতন্ত্র নাট্যলক্ষণাত্মক নাটক তাঁর রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলি যেখানে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বাস্তবাদিতার সঙ্গে সংকেতরীতিকে প্রয়োগ করেছেন।

গণ নাটকের যুগ :

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

গণনাট্য আন্দোলনের হাত ধরেই বিজন ভট্টাচার্যের বাংলা নাটকে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক বিনয় ঘোষের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে প্রথম এসেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভিক কাল থেকে সেই সংযোগ গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার পর (মে, ১৯৪৩) আরো দৃঢ়মূল হয়েছে। একে একে গণনাট্যের প্রয়োজনায় অভিনীত হয়েছে তাঁর লেখা নাটক ‘আগুন’, ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’ প্রভৃতি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রকাশিত প্রথম ইস্তাহারে এইঅর্থে ‘গণ’ বা সমাজের সাধারণ বৃহত্তর শ্রমিক- কৃষক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছিল। মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সংঘ বিশ্বাস করত ‘মানুষের ইতিহাস , শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।’ গণনাট্যের এই সুরই প্রতিফলিত হয়েছে নবান্ন নাটকে। চল্লিশের দশকে মার্কসীয় বস্তুবাদী জীবন দর্শন গনচেতনায় যে যে নির্দিষ্ট রূপ পেতে চলেছিল, সেই জীবন দর্শনেই নাটকের শেষে ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সচেতন অঙ্গীকার হয়ে উঠেছে।

দিগ্বিদ্বন্দ্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দিগ্বিদ্বন্দ্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ ও প্রগতিশীল নাট্যকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশে যে সমাজ পরিবর্তনের নানা দিক সূচিত হয়েছিল, যে বৈপ্লবিক চেতনার উদয় হয়েছিল তার অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন।

এরই বহুস্বরিক কিছু কোলাজ ধরা পড়েছে দিগ্বিদ্বন্দ্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে। আলোচনার এ পর্বে দিগ্বিদ্বন্দ্বিতার নাটক থেকে সেই দুঃসময়ের নানা ছবি তুলে ধরা যায় দিগ্বিদ্বন্দ্বিতা ১৮ টি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি সামাজিক নাটক হল – অন্তরাল, জীবনস্রোত, কেউ দায়ি নয়, স্বর্গের সিঁড়ি। তাঁর চল্লিশের দশকের নাটকগুলি হল – দীপশিখা(১৯৪৪), অন্তরাল(১৯৪৫), তরঙ্গ(১৯৪৬), বাস্তবিতা(১৯৪৭), পূর্ণাঙ্গ(১৯৪৮)।

তুলসী লাহিড়ীর নাটক

তুলসী লাহিড়ী বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা নাটকের অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রথম জীবনে চিত্রজগতের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও পরিণত বয়সে তিনি নাটক ও নাট্যমঞ্চের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং নাট্যজগতে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরম মমতায় অঙ্কিত সমাজের উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত মানুষগুলিকে তিনি যেন জীবন্ত করে তুলে এনেছেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, তাদের, ভাষা, সংস্কার, রীতি নীতি ও তাদের জীবন সমস্যার বাস্তব রূপকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার অভিমুখ

সাহিত্য একটি প্রবহমান প্রক্রিয়া। সময়ের নানা অভিজ্ঞানকে ধারণ করে করতে করতে এগিয়ে চলে। মানবের সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতির নিরবচ্ছিন্ন পদযাত্রা রূপ পায় সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ও বিবর্তমান নানা প্রকরণে, নানা ভাবে, নানা রূপে। তাই যা নিরবচ্ছিন্ন ও বিবর্তমান তাকে কোনো একটি সময়ের নির্দিষ্ট সীমারেখায় বাধা যায় না। অন্যভাবে বলা যায় সময়ের সীমারেখার বাধলে সাহিত্য স্বধর্ম চ্যুত হয়। তবু কালের যাত্রাপথের ঘটমান ঘটনার মধ্য দিয়ে যে অভিমুখে নির্মিত সাহিত্য স্বতন্ত্র একটি ভাষ্যের আধার হয়ে ওঠে তা স্বীকার করতেই হয়। কোনো নির্দিষ্ট শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যা আগের পর্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাকে কেন্দ্র করে যখন সাহিত্যের বাঁক নির্মিত হয় তখন তা সমকালের দৃষ্টিতে আগের শতকের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আলাদা রূপ পরিগ্রহ করে যা আভাস দিয়ে থাকে ভবিষ্যতের সাহিত্যের পথের দিশা কী হবে। বিশ শতকের সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যে সকল দিক পরিবর্তনের আভাস ফুটে ওঠে তার মধ্যে বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা ও তার সঙ্গে মানুষের সমচেতনের নানান খেলা, মানব মনের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুদ্ধ প্রকৃতি সাহিত্যের প্রকরণের মধ্যে বিধৃত। একুশ শতকের সাহিত্য তথা নাট্য সাহিত্যের কথা বলতে গেলে স্বতঃই যে কথাটা বলতে হয় তা হল একুশ শতকের সাহিত্যের আধার নির্মিত হয়েছে বিশ শতকের বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে—বিশ শতকের বাংলা নাটকের পুরাণ ভাবনা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সামাজিকতা, ঐতিহাসিকতা এবং রূপক সাংকেতিকতার মতো নাটক। এরপর চারের দশকের গণনাট্য এবং এরপর নবনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার, বিকল্প ধারার থিয়েটার প্রভৃতি সংরূপ বাংলা নাটক ও থিয়েটারকে যুগের গতিপথকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশ শতকের নয়ের দশকে এসে উপসাগরীয় যুদ্ধ ও তার প্রভাব বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকেও সমানভাবে উদ্বেলিত করেছে। বিশ শতকের শেষ দশক থেকে বাংলা নাটকেও বিষয় হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ, উদার অর্থনীতির প্রসঙ্গ, ধর্ম ও রাজনীতির প্রসঙ্গ।

ক. বিশ্বায়ন ও বাংলা নাটক :

একুশ শতকের মানব সভ্যতা যে দুর্দিনের সাক্ষী, এর আগে কখনও তাকে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। সভ্যতার যাত্রাপথে এত অন্ধকার বোধ হয় এর আগে কখনও আসেনি। যুগ যুগ ধরে যে মূল্যবোধ, যে মানবতাবোধ তৈরি হয়েছিল তার অবক্ষয়ের কাল যেন সূচিত হয়েছে এই সময়ে এসে। যেখানে বাজার অর্থনীতির ভোগবাদ সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে যা সভ্যতার কাছে চরম সংকট স্বরূপ। হাজার হাজার বছর ধরে যে সমাজ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ইমারতকে চূর্ণ করায় তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে।

থিয়েটারে নাটক ও নাট্য যে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, থিয়েটার যে লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম, তাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রখ্যাত নাটককার অমল রায় তাঁর নাটকে বারংবার বিশ্বায়ন ও তার নেতিবাচকতাকে তুলে এনেছেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও পক্ষপাতহীন ভাবে। ১৯৯০-এর দশকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও উপসাগরীয় যুদ্ধ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সূত্রপাত, গ্যাটচুক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যেভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ পেতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন নৃশংসতার গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে তাকে নাটককার অমল রায় তাঁর নাটক তুলে ধরেছেন। একদিকে বিশ্বায়ন বিরোধিতার দিক, অন্যদিকে সামাজিক আবেদন। ড্রাগ, এডস, থ্যালাসেমিয়ার সম্বন্ধে যেমন প্রয়োজনীয় সচেতনতার দিক তাঁর নাটকে প্রচারিত অন্যদিকে দূষণ, পরমাণু বোমা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁর নাটকে। ‘ঘৃণা নয়’, ‘করুণাধারায় এসো’, ‘শিকার’, ‘তিমিররাত্রি’, ‘কেউটের ছোবল’, ‘অলীক পৃথিবী’, ‘আপনজন’, ‘বঙ্গে বর্গী দ্বিতীয় সংস্করণ’ প্রভৃতি নাটকে একদিকে জনগণকে সজাগ করার যন্ত্রণা অন্যদিকে প্রতিরোধী মনোভাবকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ‘কেউটের ছোবল’ নাটকে অমল রায় একইসঙ্গে ড্রাগ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, বিশ্বায়নের ফলে ‘অলীক পৃথিবী’ নাটকেও অমল রায় বিশ্বায়ন বিরোধিতার সেই রূপকে দেখিয়েছেন যেখানে কীভাবে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র আমাদের দেশীয় অর্থনীতি, মেধা ইত্যাদিকে

বিশ্বায়নের প্রভাব এই সময়ের নাটকেও পাওয়া যায় যথার্থভাবে। অমর মিত্রের ‘বালিকা মঞ্জরী’ গল্প অবলম্বনে ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর নাটক ‘পিঙ্কিবুলি’তে চরম বাস্তবতার প্রয়োগ হলেও তা যেন এক সুললিত রূপকথা। এক মিষ্টিক চলন গোটা নাটক জুড়ে।

খ. থিয়েটারে রাজনীতির প্রসঙ্গ :

একুশ শতকের বাংলা নাটক ও থিয়েটারের অন্যতম বিষয় রাজনীতির প্রসঙ্গ। বিশ শতক জুড়ে বাংলা তথা ভারতীয় প্রেক্ষাপটের নানা দিকে রাজনীতি ও তার নানান অভিসন্ধির দিক সমাজ-সাহিত্যে বারবার প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের সঙ্গে নাটক ও থিয়েটার সমানভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গকে সামনে এনেছে। একুশ শতকের বাংলা থিয়েটার চর্চায় মূলত বহুরূপী, নান্দীকার, সায়ক, পঞ্চম বৈদিক, সংসৃতি, সুন্দরম, চেতনা, রঙরূপ প্রভৃতি দলগুলির নাট্যপ্রয়োজনা মানুষের জীবন সমাজে রাজনীতির অনুসঙ্গকে তুলে এনেছেন। যেমন ‘সন্দর্ভ’-র একটি নাট্য প্রয়োজনা ‘গহ্বর’। নাটকটি ২০০৬-এর ৩০ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয় শিশির মঞ্চে। নাটককার সৌমিত্র বসু দেখিয়েছেন কাহিনীতে দর্শক দেখতে পায় তার অতিপরিচিত দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাকে। তার স্ত্রীর কাছে সে পরাজিত হয় সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব। ন্যায় পরায়ণ স্কুল শিক্ষয়িত্রী তার স্ত্রী। কিন্তু নাটকে দেখানো হয়েছে সেও একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন এক হত্যাকাণ্ডে; নিজেকে বাঁচাতে আপস করেন দুর্নীতির সঙ্গে। নাটককার, দর্শক যে পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়—যেখানে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে যেমন বাঁচা যায় না, সেখানে প্রতিরোধ করে টিকে থাকার চেষ্টাটাও অর্থহীন। নাটককার এটাও দেখিয়েছেন—নিজেকে বাঁচানোর জন্য মানুষ রাজনীতিকে ঘৃণা করে, তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের এগিয়ে আসা উচিত।

তথাকথিত জনদরদী নেতা একান্তে তার স্ত্রীর কাছে স্বীকার করে কীভাবে অশিক্ষিত গবির মানুষদের লোভ দেখিয়ে দলে টানা হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা আত্মসম্মানবোধের স্বার্থ দেখে রাজনীতিকে এড়িয়ে যায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ আঙিনায় ফেরাতে এ নাট্য প্রযোজনা নাট্য দর্শকে আশাবাদী করে সন্দেহ নেই। অসামান্য অভিনয়ে জননেতার প্রবীরের ভূমিকায় সৌমিত্র বসু ও স্ত্রী রমলার ভূমিকায় সীমা দে অসামান্য অভিনয় করেছেন।

২০০৬ সালে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যক আসন জিতে ক্ষমতায় আসে এবং তারপর শিল্পের জন্য শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া। একদিকে শাসকের জমি অধিগ্রহণের প্রয়াস অন্যদিকে জমি মালিকদের আন্দোলন। অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সরকার বিরোধী কৃষি জমি রক্ষা কমিটির আন্দোলন। স্বতঃই যুক্ত হয়ে যায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। সিন্ধুর ও নন্দীগ্রাম হয়ে ওঠে আন্দোলনের আতুড়ঘর। এই সময়ে জর্জ অরওয়েলের ‘অ্যানিম্যাল ফার্ম’ (১৯৪৫) অবলম্বনে অর্পিতা ঘোষ সমকালীন প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে নাট্যরূপ দিলেন ‘পশুখামার’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের একটি গল্পকে ভেঙেচুরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের ফ্যাসিস্ট রূপকে তুলে ধরলেন নাটকে।

গ. ছোটোদের থিয়েটার :

বয়স্ক মানুষদের নাটকের চর্চার পাশাপাশি ছোটোদের নিয়ে তাদের জন্য নাটক চর্চার কাজ শুরু হয়েছে বিশ শতকের শেষ দশকে এবং একুশ শতকেও তার ধারা সমানভাবে চলছে। ১৯৮৯ সাল থেকে প্রায় দুশো স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটকের কাজ করেছে ‘নান্দীকার’ এবং ধীরে ধীরে তা আজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। বস্তিবাসী পথশিশুদের নিয়েও নান্দীকার কাজ করে চলেছে। ২০০৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের তিনটি নাট্যসংগঠনের সঙ্গে এবং সুইডেনের একটি নাট্যদলের সহায়তায় ছোটোদের নাট্যচর্চা নিয়ে একটি প্রকল্প শুরু করে—‘চিলড্রেন ভয়েস’।

ঘ. বাংলা নাট্য চর্চায় চেতনা ও তার বিবর্তন :

১৯৭০-১৯৭১ এর সময় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চরম রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে কোনো সুস্থ সাংস্কৃতিক কাজকর্ম তখন ছিল প্রায় অসম্ভব। এমনই একটি কালপর্বে শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কিছু শিল্পভাবনায় ভাবিত মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনায় জন্ম ‘চেতনা’র। সালটা ছিল ১৯৭২-এর ২২ নভেম্বর। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায়ের। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পথ পরিক্রমা কোনো একটা পেশাদারী দলের পক্ষে যে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় তার দাবিদার চেতনা। নাট্য শিল্পের পথ কখনোই আমাদের দেশে তথা পশ্চিমবাংলায় সুগম নয়—তাকে পদে পদে অতিক্রম করতে হয় নানা বাধা, অনেক প্রতিবন্ধকতা সে হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক। চেতনা সেই বাধাকে অতিক্রম করে চলেছে তার যোগ্যতা নিয়ে। চেতনা তার তীক্ষ্ণ সচেতনতা নিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাসে শুধু

টিকে আসে তা নয়, সে বেঁচে আছে। নাট্য নির্বাচন, প্রযোজনা, অভিনয়ের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে একের পর এক সে তার শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। যার জন্য দর্শকের কাছে চেতনার নাটক সত্যিই চেতনা উদ্রেককারী। চেতনার প্রথম প্রযোজনা ‘মারীচ সংবাদ’ ১৯৭২-এ, যা তখনকার প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গে আঘাত করেছিল সজোরে। তারপর ‘ভালো মানুষের পালা’, ‘স্পার্টাকাস’, ‘রামযাত্রা’ এবং তারপর বাংলা নাট্য চর্চায় সেই বিখ্যাত প্রযোজনা ১৯৭৭-এ ‘জগন্নাথ’। এরপর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, ‘গন্তব্য’ এবং সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘ঘাসীরাম কোতোয়াল’।

ঙ. নৃত্য ও নাট্যের পরিকল্পনা: অলকানন্দা রায় (১৯৫১) :

অলকানন্দা রায়ের জন্ম ১৯৫১ সালে। নৃত্য শিল্পী হিসেবে তিনি প্রথম মঞ্চ ওঠেন চার বছর বয়সে ‘চিলড্রেস লিটল থিয়েটারে’ (CLT)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছেন CLT-র সঙ্গে এবং এগারো বছর বয়সে তিনি পেশাদার নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মূলত নৃত্যশিল্পী হলেও নাট্যশিল্পী হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেন। তিনি তাঁর সারাজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন, তেমনি যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে উন্নততর করেছে সেখানেও তার প্রতিভার বিস্তার পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথাগতভাবে তিনি তাঁর নৃত্যশিক্ষা শুরু করেন ১৯৬৩ সালে মঞ্জুলিকা দাসের কাছে। তিনি ভারতনাট্যম ও ওডিসি নাচের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি পান। দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি তাঁর নাচের স্কুল ‘চন্দ্রালোক’-এর নৃত্যের দল নিয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান করেছেন। যেমন ইউ এস এ, জাপান, সিঙ্গাপুর, লন্ডন বিভিন্ন দেশে। অলকানন্দা রায় বর্তমানে কাজ করে চলেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও বাংলার বিভিন্ন সংশোধনাগারের সাজা প্রাপ্ত আসামিদের নিয়ে। তিনি ডাঙ্গ খেরাপির মধ্য দিয়ে বন্দিদের একটি বিকল্প মানসমুজির সন্ধান দিয়েছেন। তাদের দিয়ে সংশোধনাগারের মধ্যে ও বাইরে তিনি নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান করে চলেছেন। এটি তাদের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনা এবং তাদের একটি ভালো, আনন্দপূর্ণ জীবন দেওয়ার জন্য তাদের ব্যক্তিত্বের সেরাটা বের করে আনার ঐকান্তিক প্রয়াস।

চ. ব্লাইন্ডদের থিয়েটার—থিয়েটারে ব্লাইন্ডরা :

এই সময়ের নাট্যচর্চার ধারায় অন্যতম ব্যতিক্রমী ধারার দৃষ্টিশক্তিহীনদের দ্বারা থিয়েটার। ‘শ্যামবাজার ব্লাইন্ড অপেরা’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। এখন এই থিয়েটার দলের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন এবং প্রত্যেকেই দৃষ্টিশক্তিহীন। এটি এমন একটি থিয়েটারি প্রয়াস এর মঞ্চ থেকে শুরু করে অভিনেতাদের সংলাপ ও বিষয় বিন্যাস সব সময় প্রথাগত থিয়েটারের সঙ্গে মেলে না। থিয়েটারে প্রত্যক্ষ সংযোগ হয় অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সূতরাং দর্শকের প্রত্যক্ষ আগ্রহ উদ্দীপনা একজন অভিনেতাকে আরো উদ্দীপ্ত করতে পারে তা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্লাইন্ড অপেরা এটাই স্বাভাবিক যে শিল্পী স্বপন ঠাকুর, প্রাণতোষ

ভৌমিক গোপাল দাসরা তাদের পুরো অভিনয় জীবনে দর্শককে দেখেনি কিন্তু তারা অনুভব করে নেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

ছ. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার :

একুশ শতকের থিয়েটার ও থিয়েটারি ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। মঞ্চ ভাবনার নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতার থেকে শুরু করে আলোকসম্পাত, শব্দ প্রক্ষেপণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার একটি অনিবার্য শর্ত। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতার নানান দিক একুশ শতকের প্রয়োজনায় লক্ষ্য করার মতো। বিশেষ করে চেতনার ‘মেফিস্টো’, ‘ডন তাকে ভালো লাগে’ প্রভৃতি নাটকে। যেমন ‘মেফিস্টো’তে মঞ্চ ভাবনা, আলোর ব্যবহার দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দর্শককে আবিষ্ট করে রাখে। এবং একই সঙ্গে মাঝে ‘সিনেমাটিক ভিসুয়লাইজেশন’ নাটকটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে সন্দেহ নেই। সঞ্চয়ন ঘোষ, সৌমিক চক্রবর্তী, পিয়ালি সাধুখাঁ, সুদীপ সান্যাল, দীনেশ পোদ্দার, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন প্রমুখ থিয়েটারে প্রযুক্তির উন্নততর ব্যবহার এনে থিয়েটারকে দর্শকের কাছে আরো আগ্রহী করে তুলেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

একুশ শতকের নাটককার ও বাংলা নাটক

মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)

কবি-নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত নাটক লেখা শুরু করেন ১৯৬৩ থেকে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ এই কালপর্বের মধ্যে তিনি পাঁচশয়ের বেশি কবিতা লিখেছেন এবং ১৯৬৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত নাটক লিখেছেন শতাধিক। আমৃত্যু এই ধারা অব্যাহত ছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শতাধিক নাটকের প্রকাশকাল, প্রযোজনা, নাট্য সমালোচনার পরিচয় পাই। এই নাট্যকীর্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যবৈভব অনুধাবন করতে পারি। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সত্তার নির্মাণ তাঁর কবি সত্তার উপর; প্রথমে তিনি কবি পরে নাটককার। কণ্ঠনালীতে সূর্য, নীল রঙের ঘোড়া, মৃত্যুসংবাদ, গিনিপিগ, ক্যাপ্টেন হুররা, রাজরক্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটক দিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক রচনার শুরু ও খ্যাতির সূচনা এবং একুশ শতকে তাঁর নাটক ও নাট্য আলোচনা।

মনোজ মিত্র (জন্ম - ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৮)

নাটককার মনোজ মিত্র। অন্য সত্তায় তিনি অভিনেতা, নির্দেশক ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। ১৯৫৮ থেকে ২০২৪ এই দীর্ঘ ছয় দশকে তিনি শতাধিক নাটক রচনা করেছেন। অতি সাধারণ তুচ্ছ অনাদ্রিত-অনালোকিত মানুষ ও সমাজই তাঁর নাটকের বিষয়। সাধারণ জনগণের কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ-ব্যর্থতা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে নিরাসক্তভাবে। গ্রামজীবনের সারল্য, তাদের ভাষা আমাদের অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। সাহিত্য-কাব্য দর্শন, ইতিহাস-পুরাণ-লোককথা-মিথ, বঞ্চিত মানুষের লড়াই ও বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা তাঁর নাটকে নিজস্ব শৈলীতে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। উত্তর স্বাধীনতার যুগে বিজন ভট্টাচার্য-উৎপল দত্ত-বাদল সরকার-মোহিত চট্টোপাধ্যায়-মনোজ মিত্র এই পাঁচ জন নাটককার বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চাকে বিশ্ব নাট্যচর্চায় তুলে ধরেছেন।

বিষয় ও ভঙ্গির বৈচিত্র্যে মনোজ মিত্রের নাটক সমকালের কাছে এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস সন্দেহ নেই। কখনো হাসির নাটক, কখনো ক্রোধের নাটক, কখনো অপার রহস্যভরা তাঁর নাটকের শরীরে। মৃত্যুর চোখে জল(১৯৫৯), নীলকণ্ঠের বিষ(১৯৬১), চাকভাঙা মধু(১৯৬৯), নৈশভোজ(১৯৮৫), তক্ষক(১৯৬২), অশ্বখামা(১৯৬৩), ব্ল্যাক প্রিন্স(১৯৬৪), অবসন্ন প্রজাপতি (১৯৬৪), বেকার বিদ্যালংকার(১৯৬৪), আরক্ত গোলাপ(১৯৬৫), পাহাড়ি বিছে(১৯৭৬-৭৭)

চন্দন সেন -

নাটক একটি দ্বি-মুখী সাহিত্য প্রয়াস। একই সঙ্গে পাঠমুখীনতা এবং সেইসঙ্গে তার নাট্যমুখাপেক্ষীতাকেও স্বীকার করতে হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত রচিত সব নাটকই যে একই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছে তা নয়। চন্দন সেন সেই সফল নাট্যকারদের মধ্যে একজন যার নাটকের নাটকের মধ্যে নাট্যনির্মাণের যাবতীয় সম্ভাবনার সুযোগ রয়েছে। নাটকের গ্রন্থনা, সংলাপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে অতিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা পাঠক দর্শকের কাছে তাঁর নাট্যকর্মকে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ—তিনি নাটকের বিষয়কে সময় থেকে সময়োত্তীর্ণ করেছেন তাঁর সাবলীল নাট্যভাবনার মধ্য দিয়ে। বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারায় চন্দন সেন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যাও শতাধিক। চব্বিশ বছর বয়সে রচিত 'নিহত সংলাপ' একাঙ্ক নাটক দিয়ে তাঁর নাটক রচনার শুরু।

তাঁর নাটক রচনা সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতির বিষয়। চন্দন সেনের নাটক রচনা সূত্রপাত 'নিহত সংলাপ' দিয়ে (১৯৬৭) যখন সময়টা ষাটের দশকের শেষ, উত্তাল রাজনৈতিক আবহ, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি। একদিকে পুঁজিপতির স্বার্থচালিত শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন অন্যদিকে মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী বামপন্থীদের গণবিক্ষোভে উত্তাল বাংলা।

ইন্দ্ৰাশিস লাহিড়ী -

ইন্দ্ৰাশিস ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং একান্ত জীবনমুখীনতা তাঁকে টেনে আনে নাটকের জগতে। প্রথম নাটক 'অগ্নিভূক'-এ নতুনত্ব লক্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো। একজন তরুণ নাট্যকারের প্রথম নাটক অথচ সমকালীন বা খ্যাতিমান কোনও নাট্যকারের বা নাটকের প্রভাব ছাড়া ইন্দ্ৰাশিস সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবনার পরিচয় রাখলেন এ নাটকে। ইন্দ্ৰাশিস লাহিড়ীর খ্যাতির শুরু অন্য যে নাটক দিয়ে—চেকভের ছোটগল্প অবলম্বনে নাটক 'হরিপদ হরিবল'। 'চেতনা'র নাট্য উৎসবে সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এ নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। নাটকের বিষয় উপস্থাপন, সংলাপ ও কাহিনি দ্বন্দ্ব নির্মাণে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর আছে এ নাটকে। সাধারণভাবে এই গল্পের মধ্যে মিশে আছে 'কৃষ্ণ কৌতুক'। যেখানে মধ্যবিত্ত এক কেরানির নিত্যদিনের বাঁচা আর নিত্যদিন মৃত্যুর কাছে আত্মবিসর্জন একটা প্রাত্যহিক ঘটনার বিষয়। একেই নাট্যকার ইন্দ্ৰাশিস তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন, যেখানে 'কৃষ্ণ কৌতুক' রূপটি ব্যবহৃত হলো অথচ প্রচলিত কোনও ধারা রীতিকে অবলম্বন না করে। নাটকের মধ্যে একই সঙ্গে কৌতুক মিশ্রিত জীবন ও জীবনের কারণ্য প্রকাশিত হলো একই সঙ্গে। যেন জীবনের দুটি সহজাত রূপ কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দেখা দিয়েছে 'হরিপদ হরিবল' নাটকে।

ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর নাটক রচনা শুরু তার স্কুল জীবন থেকে—একটি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন ‘মরবে ইঁদুর বেচারা’। বিষয় গ্রন্থণা ও সংলাপের বাস্তবধর্মীতায় অনুবাদ নাটকটি মূলকে অনুসরণ করলেও সময়ের স্বর ও ভাষাও উঠেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাংলা নাটক ও নাট্য চর্চার সঙ্গে ইন্দ্রাশিসের মূলত পথ চলা শুরু হয় রামপ্রসাদ বণিকের হাত ধরে। রমাপ্রসাদ বণিক সমকালীন থিয়েটারের একজন প্রতিষ্ঠিত নাটককার, নির্দেশক ও অভিনেতা। ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর সংযোগ সূত্র নির্মিত হয় রমাপ্রসাদ বণিকের সঙ্গে। রমাপ্রসাদ বণিক তখন নতুন দল তৈরি করেন ‘চেনামুখ’। বহুরূপী থেকে বেরিয়ে তাঁর নতুন পথের দিকে পা বাড়ানো। এই সময় রামপ্রসাদ বণিকের পরামর্শে ইন্দ্রাশিস অনুবাদ নাটক রচনায় হাত দেন। রূপান্তর করতে থাকেন একের পর এক নাটক। সেই সময় তিনি সেই সময় তিনি টেনিসি উইলিয়ামসের স্ট্রিককার নেম ডিজায়ারকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ‘ইচ্ছেগাড়ি’, ‘চেনামুখ’,-এর প্রয়োজনায় ইচ্ছেগাড়ি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এক কথায় রমাপ্রসাদ বণিক ও ইন্দ্রাশিসের যৌথ ভাবনায় ইচ্ছেগাড়ি এক অসামান্য সাফল্যের শিখরে ওঠে। বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চায় ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর প্রথম সফলতা ‘ইচ্ছেগাড়ি’। অর্থাৎ অনুবাদ নাটক দিয়েই।

ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর অন্যান্য নাটক—‘দৃষ্টিকন্যা’, ‘লজ্জাতীর্থ’, ‘জলজ্যাস্ত’, ‘লবডঙ্কা’ ইত্যাদি।

দেবাশিস মজুমদার (জন্ম-২২ জুলাই ১৯৫০) -

দেবাশিস মজুমদার বিশ ও একুশ শতকের একজন প্রখ্যাত নাটককার, নির্দেশক এবং মঞ্চ-রূপকার। শূদ্রক নাট্যদলের প্রাণপুরুষ। কবিতা লেখা, ছবি আঁকা এবং রাজনীতির চর্চার পাশাপাশি সাহিত্য পাঠ ছিল তাঁর কাছে ভালোলাগার বিষয়। শৈশব-কৈশোর বিহারে কাটানোর জন্য তিনি হিন্দিটাও জানতেন খুব ভাল করে। একদিকে মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তীব্র ভালোলাগার থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার গভীর প্রভাব পড়েছে তাঁর উপর। শুরু হয়েছে নাটক লেখা ও নাট্যচর্চার। দেবাশিস মজুমদারের নাটকের ভাষা ও বক্তব্য স্পষ্ট। তাঁর লেখা বহু নাটক হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও অনুদিত ও মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে। যেমন - ‘অমিতাক্ষর’, ‘রাঙামাটি’, ‘দানসাগর’, ‘সমাবর্তন’, ‘ঈশাবাস্য’, ‘স্বপ্নসত্ত্বতি’, ‘অসমাগু’ প্রভৃতি। আর্ত-বিপন্ন মানুষের কথাই তাঁর নাটকে বার বার উঠে এসেছে। তাঁর নাটকের প্রধান কিছু চরিত্র - পুনম-ঘিসু-নীহারবালা-মাধো-ত্বিষাস্পতি বাংলা নাটকের অপূর্ব সৃষ্টি।

তীর্থঙ্কর চন্দ (জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯-) -

তীর্থঙ্কর চন্দ জন্ম গ্রহণ করেন আসামের কাছাড় জেলার পয়লাপুরে। তীর্থঙ্করের নাট্যমনন তৈরি হয়েছিল অধ্যাপক পিতা আর নাট্যকর্মী মায়ের প্রভাবে। বাবা ছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইংরেজির অধ্যাপক। সেজন্য ছাত্রজীবন থেকেই তিনি একদিকে যেমন বাবার সান্নিধ্যে সেক্সপিয়র চর্চা করতে পেরেছিলেন তেমনই মায়ের সান্নিধ্যে নাটকের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটে স্বাভাবিকভাবে। ছাত্রজীবনেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং শিলচরের গণসংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। বাড়িতেই ছিল একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হলেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর আবেগ।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম-২৫ নভেম্বর ১৯৬৪) -

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এই সময়ের একজন খ্যাতিমান নাটককার। অর্থনীতির অধ্যাপক হলেও বাংলা নাটক রচনা ও নাট্যচর্চার ধারায় তিনি স্বকীয় ক্ষমতায় জায়গা করে নিয়েছেন। একদিকে যেমন মৌলিক নাটক রচনা, তেমনি বিভিন্ন সাহিত্য থেকে বিষয়কে নাট্যরূপ দিতেও তিনি স্বচ্ছন্দ। প্রায় দেড়শ নাটক তিনি রচনা করেছেন। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নাটকের বিষয় ও প্রকরণে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যগুরু বলে মনে করতেন তা তিনি তাঁর স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন। ‘সংলাপ রচনা এবং গল্পবিন্যাসে মোহিত-নাট্যের মুগ্ধতা চখে পড়ে। অ্যাবসার্ড বা উত্তর আধুনিক নাট্যরচনায় তিনি মোহিত সৃজনের সার্থক উত্তরসূরি।’ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ‘ভাষানগর’, ‘রক্তমাংস’, ‘কবিকৃতি’, প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছে।

ব্রাত্য বসু (জন্ম-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯) -

ব্রাত্য বসু তিনি যেমন এই সময়কালের সফল নাটককার, পাশাপাশি তিনি একজন নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, চলচ্চিত্রাভিনেতা, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক। কালিন্দী ব্রাত্যজনেরও কর্ণধার ও ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের সম্পাদক ব্রাত্য বসু।

গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে প্রথমদিকে বিদেশি নাটকের অনুবাদ দিয়ে প্রযোজনা শুরু করলেও ষাটের দশকে এসে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্ররা গ্রুপ থিয়েটারে মৌলিক নাটক হাজির করান এবং এই ধারার ক্ষেত্রে অন্যতম সংযোজন বলা যায় ব্রাত্য বসু। ব্রাত্য বসুর নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক সমকালের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর নাটক একই সঙ্গে যেমন মঞ্চসফল তেমনই তার সাহিত্যগুণও পাঠকের কাছে সমানভাবে স্বীকৃতি পায়। ‘অশালীন’ নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে পাঠক ও দর্শকের মনে জায়গা করানো। নাটকের নামকরণে ‘অশালীন’ নামটি থাকলেও নাটকটির বিষয় প্রকৃতপক্ষে অশালীন নয়, বরং একটি সিরিয়াস নাটক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরম হাস্যকর রয়েছে যা নাটকটির মানকে নাড়িয়ে তোলে। ‘মুখোমুখি বসিবার’ নাটকের বিষয় নারী-পুরুষের হৃদয়ঘটিত জটিল বিষয় এবং পুরো নাটকের মধ্যে একটি কাব্যিক সৌরভ ছড়িয়ে আছে কিন্তু তা নাটকের গতিকে রুদ্ধ করেনি অথচ নাটকটিকে একটি অন্যস্বাদে উত্তোরণ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

একুশ শতকের থিয়েটারে মহিলা পরিচালক

একুশশতকের বাংলা নাট্যচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সকল মহিলা পরিচালক তথা নির্দেশকের নাম অগ্রগণ্য, তাঁরা হলেন উষা গাঙ্গুলী, সোহাগ সেন, শাঁওলী মিত্র, জয়তি বোস, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, সীমা মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা ঘোষ, সোহিনী সেনগুপ্ত প্রমুখ।

উষা গাঙ্গুলী:

বাংলা নাটকচর্চা বা থিয়েটারের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব উষা গাঙ্গুলী। থিয়েটারে অভিনয় ও পরিচালনাকে নিজস্বতার সঙ্গে তিনি অস্থিত করেছিলেন। একজন সমাজকর্মীর মতোই তিনি থিয়েটারকে অবলম্বন করে সমাজের, দেশের সমস্যামূলক দিকগুলোকে জনমানসে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে হিন্দিভাষী হলেও কলকাতায় বসবাসের ফলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির কোনও সীমানা থাকতে নেই; সংস্কৃতি তার আপন টানে মানুষকে আকৃষ্ট করে। শিল্পবোধের উন্মেষের মধ্য দিয়েই মানুষের বোধের বারবার পুনর্জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ থাকলেও জীবনের একটা পরে এসে থিয়েটারকেই জীবনের ব্রত হিসেবে ধরে নেন। তৈরি করলেন নতুন থিয়েটার দল ‘রঙ্গকর্মী’ (১৯৬০)। তিনি নিজেকে নাট্য নির্দেশক হিসেবে দেখার চেয়ে নিজেকে প্রকৃত অর্থে রঙ্গকর্মী বলতেই পছন্দ

শাঁওলী মিত্র:

এক নীরব নিস্তব্ধ একক সাধনার পরম্পরায় উত্তরাধিকার শাঁওলী মিত্র। একান্ত সাক্ষাৎকারে শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে শাঁওলী মিত্র জানিয়েছেন—‘আমি খুব একা হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। আমি ছটফট করছি না। বরং ধীরস্থির হচ্ছি। তখন আমি নিজেকে নিয়ে বসে দেখছি, আর কেউ নেই। আমি একা। আমার বাবার মতো।’ বাবা মায়ের একক একাধ্র সাধনার সুরের অনুরণন শাঁওলী মিত্র। তাঁর কথায় শম্ভু মিত্র ছিলেন তপস্বী এবং তৃপ্তি মিত্র তপস্বিনী। শম্ভু মিত্রের একাকিত্বের একটা পার্থক্যের কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন—‘মায়ের একাকিত্বে একটা উসখুস চঞ্চলতা ছিল। শম্ভু মিত্র ছিলেন একক সাধক। বাবার সেই নিস্তরঙ্গ একলাপনায় গভীরতা অতল।’ শাঁওলী মিত্র সারাজীবন সেই অতলতর সন্ধান করে গেছেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে থিয়েটার তাঁর একটা অঙ্গ। মাত্র চার বছর বয়সে প্রথম অভিনয় শুরু ‘ছেঁড়াতার’-এ। এরপর ‘দশচক্র’ এবং ‘ডাকঘর’ করতে করতে কিশোরী থেকে যুবতী শাঁওলী।

১৯৭৪ সালে ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি-তর্কো আর গল্পো’-তে মা-মেয়ের বলিষ্ঠ অভিনয়। যদিও তিনি এরপর আর চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নিজেকে আনেননি। নাটকই তাঁর ভালোবাসার জায়গা। জীবনের একটা পর্বে কালিপ্রসাদ ঘোষ, বহুরূপীরই সহঅভিনেতাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও ১৯৭৭-এ বিবাহ বিচ্ছেদ হলো শাঁওলী-কালিপ্রসাদের। শম্ভু মিত্র বহিষ্কৃত হলেন বহুরূপী থেকে। তিনি তখন গৌতম বুদ্ধের জীবনী নাটক লিখছেন। নাটক শেষের আগেই তাঁর আর এক নির্বাণলেখ্য। তিনি বরণ করে নিলেন এক অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত জীবন। একলা থাকার মজ্জা চালিত করলেন নিজেকে। একা, এক নিঃসঙ্গ জীবনকে অবলম্বন করলেন শম্ভু মিত্র। অন্যদিকে নিঃসঙ্গ একাকিনী তৃপ্তি মিত্র। ছাড়লেন বহুরূপীকে। তাঁদেরই উত্তরসূরি যেন সেই একলা থাকার মন্ত্রই সম্পদ করলেন জীবনে। সেতার সাধক বিলায়েত আলি খাঁর একটি উদ্ধৃতি ঋণ স্বীকার করে শাঁওলী মিত্র বলতেন—পৃথিবীতে দুটো নাটক হচ্ছে, একটা শম্ভু মিত্র, একটা করছে শম্ভু মিত্র, আর একটা তৃপ্তি মিত্র। পরে যদিও শেষ জীবনে ভগ্নশরীরে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্ররা আবার একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলেন। এমনকি কালিপ্রসাদও।

শাঁওলী মিত্র এই শতকে এসে ২০০০ সালেই সৃষ্টি করলেন ‘সুজন ব্রতীর সীমান্ত’। নাট্য পরিচালক হিসেবে যিনি জীবনের প্রথম অংশে এক একটা নাটক করতেন ৬/৭ বছর সময় নিয়ে কিন্তু এই শতকে এসে তাঁর মধ্যে যেন একটু দ্রুততা লক্ষ করা যায়—‘পুতুল খেলা’ (২০০২), ‘রাজনৈতিক হত্যা’ (২০০৪) এবং ‘চণ্ডালিকা’ (২০০৫)। শাঁওলী মিত্রের এই সময়ের প্রয়োজনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে অনিবার্যভাবে। সমকালের রাজনীতির কদর্যতা ও ভয়াবহতার ছবি তুলে এনেছেন তাঁর নাটকে, প্রয়োজনায়। শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের ছায়ায় বেড়ে ওঠা শাঁওলী মিত্রও যেন বারবার একাকী, নিজের মতো করে সমাজের সমসাময়িক অহিতকর পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। যখন তাঁর আদর্শের পথে অন্তরায় হয়েছে সমকালের রাজনীতির ভাষা তখনও নিঃশব্দ প্রতিবাদে থেকেছেন অন্তরালে। এভাবেই তাঁর জীবননাট্যের শেষ যবনিকা পড়ে ২০২২-এ।

সীমা মুখোপাধ্যায়:

বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক উষা গাঙ্গুলীর মতো সীমা মুখোপাধ্যায়ও বিশ্বাস করতেন একটা নাট্য প্রয়োজনা কখনোই আমার হতে পারে না। উষা গাঙ্গুলী কখনোই নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্য প্রথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর দল যখন কোনও নতুন নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতো তখন সব সদস্য একসঙ্গে মিলে বসে মতামতের মধ্য দিয়ে নাটকটি কীভাবে মঞ্চস্থ করা যাবে বা সফল নাট্য কীভাবে সম্ভব তা নির্ধারণ করতেন। এই আলাপচারিতা, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্মশালা ভিত্তিক প্রস্তুতি নিতেন এবং নাট্য সাফল্যকে সবার মধ্যে ভাগ করে নিতেন। সীমা মুখোপাধ্যায়ও পরিচালক হিসেবে একই পথের নাট্যকর্মী। ‘রঙরূপ’ নাট্যদল ও সীমা মুখোপাধ্যায় নামটা যেন একে অপরের পরিপূরক। উল্লেখ্য, সীমা মুখোপাধ্যায় ‘সমকালীন শিল্পীদল’-এর অম্বর রায়ের সঙ্গে ‘সংস্কব’-এর হয়ে ‘ধ্বনিস্তম্ভ’ নাটকটিতে অভিনয় করেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। বস্তুত সমকালীন শিল্পীদল হয়তো

পরোক্ষ তঁর পরিচালক জীবনের সূত্রপাতের অন্যতম সহায়ক। কারণ তিনিই সীমা মুখোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মহিলা পরিচালকদের নিয়ে নাট্যমেলা আয়োজন করার। এবং ঘটনাচক্রে সেই সূত্রেই সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাট্য পরিচালনায় যোগদান। তঁর নির্দেশিত প্রথম নাটক তৃপ্তি মিত্রের ‘বলি’ (একাঙ্ক, ১৯৯৩)। ‘বলি’ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও নিজেকে অশেষণের তাড়না আছে সেটা তঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীতে ‘পঞ্চম বৈদিক’ ও ‘বলি’-র শ্রুতি নাটক করে এবং সেখানেও সীমা মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেন।

অর্পিতা ঘোষ:

এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেত্রী ও পরিচালক অর্পিতা ঘোষ।

২০০২ সালে সুকুমার রায়ের ‘হয়রলব’—নাট্যরূপ দিলেন অর্পিতা ঘোষ, শাঁওলী মিত্রের পরামর্শ মতো প্রায় ২০ জন বাচ্চাকে নিয়ে। এবং এই সময়েই তঁর প্রথম অনুবাদ নাটক বা ইংরেজি নাটক ‘Crime Passionel’-এর নাট্যরূপ দিলেন ‘রাজনৈতিক হত্যা’ এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ২০০৪ সালে এবং এই নাটকের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন দুর্বলভাবে চলতে থাকা ‘পঞ্চম বৈদিক’ আবার নতুনভাবে বেঁচে উঠল। ২০০২ সালের প্রযোজনা ‘পুতুল খেলা’ নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি সহকারের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। ২০০৫ ‘চণ্ডালী’ মঞ্চস্থ হয় শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায়। অর্পিতা ঘোষ প্রকৃতির চরিত্রে ও প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় শাঁওলী মিত্র নিজে অভিনয় করেন। নাটকের মধ্য দিয়ে লোকায়ত জীবন চর্চার একটি দিক উঠে আসে অর্পিতা ঘোষের জীবনদর্শনে। তঁর কথায় লোকচর্চার প্রেক্ষিতে তৈরি এ নাটকের মধ্য দিয়েই যেন তঁর জীবনের বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে তঁর জীবনে। রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ গদ্য নাটক ও নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’র মধ্য দিয়ে যে মানবতাবাদ ও লোকজীবনের উত্তরণকে তুলে ধরা হয়েছে তাকেই শাঁওলী মিত্র ও অর্পিতা ঘোষ সমকালীন সময়ের নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মর্যাদাবোধকে রূপায়িত করেছেন বাস্তবোচিতভাবে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘শাদুল কর্ণাবদান’ গ্রন্থে লোকায়ত জীবনের যে উত্তরণ তাকেই রবীন্দ্রনাথ ‘চণ্ডালিকা’ ও ‘নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা’ নতুনভাবে রূপায়িত করেছেন। এবং ২০০৫-এ ‘পঞ্চম বৈদিক’-এর প্রযোজনায় ‘চণ্ডালী’র মধ্য দিয়ে তাকেই সমকালীনতার সঙ্গে বেঁধেছেন আশ্চর্যভাবে। নারীর বাহ্যিক রূপ না তার আত্মশক্তির উদ্বোধনকে প্রকৃতিরূপী অর্পিতা ঘোষ ও প্রকৃতির মা হিসেবে শাঁওলী মিত্র পারস্পরিক বলিষ্ঠ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

২০০৫-এ অরওয়েল-এর ‘1984’ ও ‘অ্যানিমাল ফার্ম’ উপন্যাস দুটি পড়েছিলেন এবং মনস্থ করেন এর নাট্যরূপ দেওয়ার। করে তুলেছিল রাজনীতির কারবারিদের উদ্দেশ্য প্রকৃত অভিসন্ধি। তাই-ই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল এ নাটকে।

২০০৬-এ ‘পশুখামার’ মঞ্চস্থ হয় ২২

২০১১ সালে তঁর নাট্য প্রযোজনা ‘এবং দোয়ানী’। ২০১৩ ও ২০১৪-এ দুটি নাটক—একটি আর্থার কোয়েস্টলারের বিখ্যাত উপন্যাস ‘ডার্কনেম অফ নুন’-এর নাট্যরূপ ‘অস্তমিত মধ্যাহ্ন’ ও ব্রাত্য

বসুর 'দুটো দিন' নাটক। ২০১৫ সালে মঞ্চস্থ হয় জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের নাট্যরূপ 'কারুবাসনা'। এই নাটকের প্রযোজনায় দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সিনোগ্রাফি নাটকটিকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। সুজন মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জয় গোস্বামীরা নাটকের মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

২০১৭ সালের নাটক জঁ পল সার্ত্রের কাহিনি 'দ্য ফ্লাইম' অবলম্বনে নাট্যরূপ 'মাছি'। এই নাট্যের মূল হলো ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। ২০২০-র নাটক 'ভিটন'।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একুশ শতকের থিয়েটারের নেপথ্যে

সমকালীন প্রেক্ষাপটের থিয়েটার চর্চার জন্য যা অত্যন্ত অপরিহার্য তা হল সামগ্রিক নাট্য প্রযোজনার মানকে উন্নত করতে হবে- যেখানে নাটকের বিষয় নির্বাচন থেকে তার উপস্থাপনের সামগ্রিক মননশীল শর্তকে মান্যতা দিয়ে।

আধুনিক সময়ের থিয়েটার চর্চার জন্য যে বিষয়কে স্মরণে রাখতেই হয় তা হল থিয়েটার এক স্বতন্ত্র শিল্পকলা। থিয়েটার অন্য শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাঙ্ক্ষিত শিল্পচর্চার মাধ্যম। একুশ শতকে এসে থিয়েটারের ভাবনা এখন অনেকটাই পরিবর্তিত ও বিবর্তিতও।

সমকালীন থিয়েটারের শরীর নির্মাণে যে শর্তগুলি প্রধান হয়ে ওঠে সেগুলি থিয়েটারকে অন্য শিল্পকলা থেকে পৃথক করে। তা হল- নাটককার, নির্দেশক, অভিনেতা, আলোকশিল্পী, মঞ্চনির্মাতা, পোশাক পরিকল্পনাকারী, সংগীত-নিয়ন্ত্রক, রূপসজ্জাকার (Make-up man)- এদের সমবেত প্রয়াস। এদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটা সফল নাট্য অনুষ্ঠিত হয়। নাটককারের কাছ থেকে নাটকটি পাবার পর নাটকটির নিবিড় অনুশীলন বা পাঠ নির্দেশকের প্রাথমিক কর্তব্য। এবং নাটকটির আখ্যান বা বিষয়বস্তুর ভাবনা-চিন্তা নিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে একাধিক আলোচনার পর একটি নাট্য পরিকল্পনা তৈরি হবে। এমন নয় যে নাটককারের কাছ থেকে নাটকটি পাবার পরপরই নির্দেশক নাটকটি নিয়ে দ্রুত মঞ্চায়নের জন্য অভিনেতাদের নিয়ে মহলা শুরু করবেন এবং তা মঞ্চস্থ করতে যাবেন। নাটকটি কোথায় কোন অবস্থানে ও কোন দর্শকদের জন্য অভিনীত হচ্ছে সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা যদি না থাকে তাহলে নাট্যপরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। অতএব নাটক নির্বাচন থেকে দর্শকদের মানসিকতা, চাহিদা ও সমকালীন জনমানসের চাহিদাকে ভেবে নাট্য পরিকল্পনার সামগ্রিকতাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, কবিতা, প্রভৃতি একক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একক শিল্প নিবেদন হতে পারে কিন্তু থিয়েটার যেহেতু একটি সমবেত প্রয়াস, বহু মানুষকে নিয়ে- অসংখ্য মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি শিল্প - সেজন্য একটি নাটককে মঞ্চস্থ করতে গেলে ভালো দর্শকমণ্ডলী একটি অপরিহার্য শর্ত।

ক. দৃশ্যপট ও মঞ্চনির্মাণ :

সিনোগ্রাফি (Scenography)- শব্দটি এই সময়ের নাট্যরূপায়ণের সঙ্গে উচ্চারিত একটি অতি পরিচিত। একটা মঞ্চের সামগ্রিক-স্থানিক সত্তার দৃষ্টিগোচর অবস্থা। প্রাচীন গ্রিসে সিনোগ্রাফির প্রবর্তন হলেও প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতে সিনোগ্রাফির বহুস্তরীয় তাৎপর্য নাটকের মূল বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়তায় মিশে নাট্য বিষয়কে আরো অর্থবহ করে তোলে। প্রাচীন গ্রিসের মঞ্চের স্থান বা দৃশ্যপট

ব্যবহারের সূত্রই পরবর্তীতে উনিশ শতকে ভারতে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্য দিয়ে একুশ শতকের পরিবর্তমান মঞ্চ ভাবনায় তাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একটা নাট্য উপস্থাপনের যে সকল দৃশ্যপট বিন্যাস হয় তার সঙ্গে নাট্যের পোশাক, আনুসঙ্গিক উপকরণ বা সাহায্যকারী উপাদান, সহ আলোকসম্পাত, দৃশ্যসজ্জা এবং শব্দ প্রক্ষেপণের নানান উপকরণ দিয়ে। একটা নাটকের মঞ্চপরিকল্পনার সামগ্রিকতা নাটকের বিষয়ের পিছনে তাকে দর্শকের কাছে যথোপযুক্তভাবে পৌঁছে দিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকে। মঞ্চে ব্যবহৃত কোন দৃশ্যপট যখন দর্শক দেখে তখন দৃশ্য থেকে বিষয়ের গভীরতা আরো গভীরভাবে অনুভব করে।

খ. আলোকচিত্রণ :

থিয়েটারে আলোক-সম্পাতের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার অন্যভাবে বলা যায় একটা সুপরিকল্পিত মঞ্চ প্রয়োজনায় ও আলোক সম্পাতের বিষয়টা যেমন একদিকে ভয়ানক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বা আবার সব পরিকল্পনা শেষেও আলোকের যথার্থ ব্যবহারও নাট্যবিষয়কে দর্শকের কাছে ঠিকমতো তুলে ধরতে নাও পারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হয়েছে। আলোক পরিকল্পনাও বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে এটা প্রাথমিক শর্ত। আলোক প্রক্ষেপণের জন্য থিয়েটারকে, মঞ্চে, টেক্সটকে মুখস্থ করতে হয়। মঞ্চেও সমগ্র পরিসর ও তার প্রতিটি স্থানিক ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে যথার্থভাবে আলোকসম্পাত নাটকের বিষয়ানুগ না হতে পারার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। অতএব টোটাল থিয়েটারকে মুখস্থ করতে হবে, তার কিউগুলোকে জানতে হবে। এই সময়ের নাট্য উপস্থাপনায় যে সকল আলোকচিত্রণ করা হয় আগেকার দিনে তা হত না। অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে আলোকসম্পাত করা হয়। এখন নানা ধরনের ডিজিটাল লাইটিং কনসল্ ব্যবহার করা হয়, যা আগে হত না। যেগুলো বাংলায় ঠেলা ডিমার বলা হয় সেগুলোকে ব্যবহার করা হত। এখন যে 'বোর্ডে বসা' কথাটা মঞ্চেও সমানভাবে ব্যবহার করা হয়তা বোর্ড অর্থে 'ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট' যার মধ্য দিয়ে সহজে মঞ্চেও বিভিন্ন রকম আবহ নির্মাণে আলোকে ব্যবহার করা যায়- কখনো বা তার ইনটেনসিটি বাড়িয়ে বা কমিয়েও। যতই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হোক না কেন যথার্থ মহলার পর ও শেষ মুহূর্তের মঞ্চেও আলোকচিত্রণের ব্যাপারটা নানারকম বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা তৈরি করে।

সাম্প্রতিক সময়ের থিয়েটারের স্টেজের সঙ্গে আলোর টেকনিক্যাল সম্পর্কের জায়গাটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একটা সামগ্রিক মঞ্চপরিকল্পনা, নাট্যবিষয় উপস্থাপনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে গেছে আলোর ব্যবহার। আধুনিক সময়ের মঞ্চেও নাটকের আলোক বিন্যাসে তাপস সেন, সুদীপ সান্যাল, বাদল দাস, অশোক প্রামাণিক, দীনেশ পোদ্দাররা আলোক পরিকল্পনাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত করলেন প্রযুক্তির হাত ধরে।

গ. শব্দ পরিকল্পনা-আবহ-সংগীত অনুষ্ণ :

'নাটকে অঙ্ককার সৃষ্টি আলোর সাহায্যে,
সেরকম নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি হয় শব্দ দিয়ে...'

গৌতম ঘোষের এই অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় উক্তি দিয়ে অংশটির আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। নাটকে আলো ও শব্দের যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দুটোই যে নাট্যপ্রযোজনার দুটি অন্যতম দিক তাকেই গৌতম ঘোষ সংক্ষেপে প্রায় সবই বলে দিয়েছেন। নাটকে সংগীতের ব্যবহার নিতান্তই নাটকীয় প্রয়োজনে। নাট্যবিষয়কে দর্শক চিত্তে স্থায়ীভাবে বিস্তার করতে সঙ্গীতের ব্যবহার। আর শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও চলন দর্শককে বিমূর্ত ভাবনায় কোন এক জাগ্রত সত্তায় পৌঁছে দেয়।

যে কোনো শিল্পকলা, সাহিত্য উপলব্ধির বিষয়। তাকে অনুভব করতে হয় নিজস্ব উপলব্ধি ও ভাবের গভীরতা দিয়ে। একান্তভাবে নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে, ভাব দিয়ে, অনুভবের স্বকীয়তা দিয়ে তাকে ধরতে হয় নিজের মতো করে। কেউ বুঝিয়ে দিল এবং আমি বিষয়টা বুঝে গেলাম ব্যাপারটা এত তরলিত নয়। নিজস্ব কল্পনায় তার যে বিমূর্তভাব সৃষ্টি হয় এবং আমাদের হৃদয় সত্তাকে যখন আনন্দ দেয় তখন তা শিল্পকলা বা সাহিত্যের রূপ পায়। এবং ব্যক্তির নিজস্ব বোধের কাছে তার নান্দনিক সত্তা নিয়ে হাজির হয়। যেকোন শিল্পকলা জন্ম দেয় এক আনন্দ ও সুন্দরের - নিয়ে আসে আনন্দ ও মৈত্রীকে - যা শুধু শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিষয় নয়, বিষয় যে কোন সুস্থ সংস্কৃতিরও। নাটক একই সঙ্গে তার দেহে আত্মস্থ করে শিল্পকলা ও সাহিত্যের সেই নান্দনিক গুণাবলীকে। এক অর্থে নাটকের মহাস্রোতে সামিল হয় শিল্পকলার নানান দিক। এর মধ্যে অন্যতম হিসেবে সংগীত এবং অবশ্যই শব্দানুশঙ্গ। নাট্যভাবের বন্ধনমুক্তির মাধ্যম হিসেবে শব্দক্ষেপণের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ও আবহসংগীত অপরিহার্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে নাটকে সংগীতের ব্যবহার একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে আসছে। এবং নাটকের নাটকীয়তাকে শিল্পিত করতে সংগীতে প্রয়োগ। Edward A. Wright তাঁর 'Understanding Today's Theatre' গ্রন্থে এ বিষয়ে জানিয়েছেন- 'Sound when used correctly, can develop the mood, build the crisis, set the period and sometimes establish the basic rhythm of production.' অর্থাৎ 'শব্দ যখন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তার মধ্য দিয়ে নাটকীয় গতি, সংকটের মুহূর্ত, কাল ও সময় নির্ণীত হয়। এবং কখনো কখনো নাট্যপ্রযোজনার প্রাথমিক ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়।'

উপসংহার :

‘একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা’ বিষয়ে গবেষণায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। একদিকে এই সময়ের নাটক, তার বিষয় ও প্রকরণের নানা দিক। একুশ শতকের নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক প্রকরণের কালসীমা যে সময়ের সুনির্দিষ্ট সীমা মেনে ২০০০ উত্তর সময়ই প্রাসঙ্গিক শুধু তাই নয়; একুশ শতকের নাটকের ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক ধরে। মূলত বলা চলে বিশ শতকের নয়ের দশকের গোড়ার সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সমীকরণ বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের সূচক হয়ে উঠেছে। নাটকের ক্ষেত্রে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্ররা সেদিক থেকে দুই শতকের নাটকের শিল্প-প্রকরণের ও বিষয় নির্বাচনের সেতুবন্ধনকারী। নাটককে ভালোবেসে এবং নাট্যশিল্পের প্রয়োজনে তাঁরা নাটককে ও তার প্রয়োগশৈলীকে সযত্নে পোঁছে দিয়েছেন একটা শতাব্দী থেকে আরেকটি শতাব্দীর কাছে। বিশ শতকের আট ও নয়ের দশক জুড়ে বাদল সরকার বাংলা নাটককে তার প্রথাগত খোলস ছাড়িয়ে নতুন পথ দেখালেন। বিশ শতকের সাতের দশক ভারতীয় নাটকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতবর্ষের চার প্রদেশ থেকে চারজন নাটককার উঠে এলেন, যাঁদের বয়সগত সময়ের ব্যবধানও খুব বেশি নয়, মাত্র ১৩ বছরের। দিল্লি থেকে হিন্দি নাটককার মোহন রাকেশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাদল সরকার, পশ্চিমের মুম্বাই থেকে মারাঠি নাটককার বিজয় তেডুলকার এবং কর্ণাটক থেকে কন্নড় নাটককার গিরীশ কারনাড। ভারতীয় নাটকের কাছে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ভারতীয় নাটককে, নাট্যচর্চার ধারাকে নতুন যাত্রা পথের সন্ধান দিয়েছেন এই চতুষ্টয় নাটককার। এই চারজনের মধ্যে মোহন রাকেশ ১৯৭২-এ মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মারা যান কিন্তু ভারতীয় নাটকের পরীক্ষালব্ধ নতুন ধারাকে বহন করে নিয়ে একুশ শতকে পোঁছে দিয়েছেন বাদল সরকার, বিজয় তেডুলকার ও গিরীশ কারনাড। বিজয় তেডুলকার ও বাদল সরকার মারা গেছেন ২০০৮ ও ২০১১ সালে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বৌদ্ধিক নাট্যচর্চায় নাটককে আধুনিক পথের আলো দেখিয়ে গেছেন। গিরীশ কারনাড ভারতীয় নাটকের নতুন ধারাকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বহন করে গেছেন। বাদল সরকার বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারাকে সঞ্জীবিত করেছেন তাঁর স্বতন্ত্র প্রতিভা দিয়ে। একজন সম্পূর্ণ সমাজসচেতন সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন বাদল সরকার। সমাজের বুকো নিত্য ঘটে চলা ছোটো ছোটো ক্রটিও যে একসময় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তাকে চিহ্নিত করে গেছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। প্রথমত তাঁর নাট্য জীবনকে যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম অংশে অবশ্যই তাঁর নাটককার সত্তার পরিচয় উঠে আসে, যেখানে সমকালের কাছে তিনি ব্যতিক্রমী নাট্যপ্রতিভার স্বীকৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন এবং দ্বিতীয়াংশে অবশ্যই তাঁর নাট্যচর্চার সত্তা। যেখানে আবার তিনি তাঁর নাটক রচনা করেছেন একদিকে প্রসেনিয়ামের জন্যে এবং আরেকদিকে তাঁর নাটক অঙ্গন মঞ্চ বা তৃতীয় ধারার জন্য, যা ‘থার্ড থিয়েটার’ নামে বেশি পরিচিত। বাদল সরকার তাঁর এই নাট্য সংকল্পকে একুশ শতকের নাটক ও নাট্যচর্চার কাছে অর্পণ করেছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশ শতকে তাঁর নাটক রচনা ও নাট্য চর্চা শুরু করলেও একুশ শতকেও সমানভাবে উজ্জ্বল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বিষয় ও প্রকরণ সমকালের কাছে ব্যতিক্রমী। তিনি একুশ শতকে পোঁছেও প্রায় চল্লিশের বেশি নাটক রচনা করেছেন। কিমিতিবাদী নাটককার নামে খ্যাত মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বাদল সরকারের ‘এবং ইন্ডিজিং’ নাটককে অ্যাবসার্ড নাটক

বললেও তা কি সত্যিই অ্যাবসার্ড? তেমনই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’, ‘মৃত্যু সংবাদ’, ‘চন্দ্রালোকে অগ্নিকাণ্ড’ বা ‘নীলরঙের ঘোড়া’ সেই অর্থে কি সত্যিই অ্যাবসার্ড নাটক? আসলে এই গোত্রের নাটকের গঠন, চরিত্র চিত্রণ, মঞ্চ-প্রকল্প, আখ্যানের বয়ান বা সংলাপে আক্ষরিক অর্থে যেন অবাস্তবতা নেই। আছে সময় ও সমাজকে মূল্যায়ন করার কঠিন কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি। মোহিত চট্টোপাধ্যায় সেই ধারাকে বহন করে চলেছেন ২০১২ সাল পর্যন্ত। এবং দুই শতাব্দীর সেতুবন্ধনকারী বাংলা নাটককারদের মধ্যে মনোজ মিত্র বর্তমানেও তাঁর শিল্পীত সত্তার বহুমুখীনতার উপর সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

একুশ শতকের নাট্যচর্চার মধ্যে গবেষণায় উঠে এসেছেন আরো যাঁরা—চন্দন সেন থেকে শুরু করে ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার, তীর্থঙ্কর চন্দ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, মনীশ মিত্র, সৌমিত্র বসু, শেখর সমাদ্দার, ব্রাত্য বসু প্রমুখ নাট্যকাররা।

এই সময়ের নাট্যচর্চায় বিকল্প ধরণের কিছু প্রয়োজনা সংযোজিত হয়েছে, যেমন মনীশ মিত্রের ‘উরুভঙ্গম’। বাংলা নাটকের অভিনয়ের ধারাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে, ৬ থেকে সাড়ে ৬ ঘণ্টার প্রয়োজনা, সারা রাতের নাট্য। আবার নান্দীকার, ব্রাত্যজন, মিনার্ভা রিপারটরি, বিভাস চক্রবর্তীর নাট্য সংকল্প তাদের থিয়েটার ওয়ার্কশপ, সেমিনারের মধ্য দিয়ে সমকালীন নাট্য ভাবনার বহুমুখি দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। একুশ শতকের থিয়েটারের আরেকটি অন্ধকারময় অধ্যায় অতিমারির সময়ের(২০২০-২০২১) সংকট। যেখানে অতিমারির সময়ে থিয়েটার শিল্পীদের দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের একটি প্রকল্পে (অতিমারী উত্তরপর্ব : পশ্চিমবঙ্গে মহিলা শিল্পীদের জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতা) উঠে এসেছে মহিলা শিল্পীদের বয়ানে সংকটের ছবি। অতিমারীর আগে কেউ অভিনয় করতেন, কেউ বা নাচ, কেউ নাটক পরিচালনার কাজ করতেন, আবার কেউ নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখতেন, কেউ মঞ্চপরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন, অতিমারীর প্রকোপে পড়ে অন্যান্য অনেক পেশার মত নাট্যকর্মীদেরও কাজের জায়গায় সঙ্কোচন ঘটে। তাদের জীবন-জীবিকা সংকটের সামনে পড়ে।

একুশ শতকের নাটকের বিষয় আখ্যানে উঠে এসেছে—মূলত বিশ্বায়ন ও তার সূত্রে বাজারি অর্থনীতি, উদার অর্থনীতির প্রসঙ্গ, বিশ্বায়ন প্রসূত বাজার অর্থনীতির ভোগবাদ সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা যে সংকীর্ণ মানসিকতার জন্ম দিয়ে চলেছে তার প্রসঙ্গ। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের যে বিশ্বায়নের সূত্রপাত, তার প্রভাব সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিসর বিশ্বজুড়ে প্রসারতা লাভ করেছে তাও গবেষণায় উঠে এসেছে। একুশ শতকের কাছে, বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া সভ্যতার সংকটরূপে ধরা দিয়েছে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনীতির পরিবর্তমান অবস্থার নানা উদগ্র চিত্রও এই পর্বের নাটকের শরীরে ধরা দিয়েছে। শাসকের ক্ষমতার হাতও প্রসারিত হয়েছে থিয়েটারের মতো স্বাধীন শিল্পসত্তায়। শিশু কিশোরদের নাট্য, ব্লাইন্ডদের থিয়েটার একুশ শতকে আরো বেশি করে অভিনীত হচ্ছে। বর্তমানের ভোগসর্বস্ব সমাজের একমুখীনতার নিগড়ে বাধা পড়ে শিশুমনের সার্বিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না, তাই তাদের যদি তাদের স্বচ্ছন্দের পরিসরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তার প্রয়াস এই পর্বের নাট্যচর্চায় অন্যতম অভিমুখ। বিশেষ করে একুশ শতকের থিয়েটারে ‘চেতনা’ তার বিভিন্ন প্রয়োজনার মধ্য দিয়ে সমকালের সমাজ-অর্থনীতি, রাজনীতির ক্ষেত্রকে তুলে ধরে সমাজকে বার্তা

দিতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গে থিয়েটারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে থিয়েটারের প্রচলিত পথে নতুন দিশা দেখিয়েছে।

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একুশ শতক স্বতন্ত্র। গবেষণায় ধরার চেষ্টা করা হয়েছে— খ্যাতিমান নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা প্রভৃতির পাশাপাশি এই সময়ের সেইসব মহিলা পরিচালকদের কথা, যারা তারা তাদের সমাজমনস্ক মানসিকতায় থিয়েটারকে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরেছেন। একুশ শতকের সার্বিক থিয়েটারি পরিকল্পনার নেপথ্য ভূমিকায় যারা থিয়েটারকে আরো জনপ্রিয় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন সেই নেপথ্য কারিগরদের প্রসঙ্গও গবেষণায় উঠে এসেছে। যেমন—মঞ্চ নির্মাণ, শব্দপ্রক্ষেপণ, আলোক সম্পাতের মতো জরুরি বিষয়গুলিতে যে প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার শুরু হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

একুশ শতকের নাট্যচর্চার যে ধারা কলকাতার শহরকেন্দ্রিক এবং তার বাইরে অর্থাৎ জেলায়ও যে নাট্যচর্চার মহতী যজ্ঞ চলছে সে বিষয়েও জেলার বিভিন্ন নাট্যদল থেকে যে তথ্য গৃহীত হয়েছে তা থেকে একটি ছবি স্পষ্ট যে, জেলার দলগুলি নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সুস্থ একটি সাংস্কৃতিক চর্চা তারা করে চলেছেন। তাদের প্রয়োজনা্য অনেক সময় তাদের আঞ্চলিকতার ছাপকে তোলার প্রয়াস করেছেন। তবে অধিকাংশ নাট্যদলের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে তার অন্যতম হল অর্থনৈতিক সমস্যা। অনেক সময় আর্থিক সংগতির অভাবে তাদের ভালো প্রয়োজনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং দ্বিতীয়ত, তাদের নানা রকম রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা যে তাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার পরিপন্থী, তাও তারা জানিয়েছেন।

‘একুশ শতকের বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা’ শীর্ষক গবেষণার ক্ষেত্রে নাটক ও নাট্যচর্চার নানা দিক স্পষ্ট হলেও গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন, প্রথমত, এই সময়কালের নাটককারদের নাটকগুলির সংগ্রহ সব ক্ষেত্রে যে একত্রে লভ্য তা নয়, অধিকাংশ থেকে বিভিন্ন নাট্যপত্রিকার পাতায় তা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজিত নাটকগুলির তথ্য ও তাদের কাছে সঞ্চিত না থাকায় একটি সঠিক মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে একুশ শতকের নাটক ও নাট্য চর্চার একটা সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ -

- অন্ধকারের সূর্য, রাখী মিস্ত্রী, পালক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২১,
- উত্তম সুচিত্রা, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪২৪,
- অপেরা মাস্টার মুরারি রায় চৌধুরী, সম্পা. আশিস গোস্বামী, অনুপমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩
- কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২০০৯
- ক্যানভাসের ও অন্যান্য নাটক, শেখর সমাদ্দার, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১ লা বৈশাখ ১৪৩০/১৫ এপ্রিল ২০২৩,
- গদ্যসংগ্রহ, অশোক মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২১, মাঘ ১৪২৭
- গ্রীক নাটক সংগ্রহ, ভাষ্য-ভাষান্তর-শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০২১/মাঘ ১৪২৭
- চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু, ঋত্বিককুমার ঘটক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪১৮/নভেম্বর ২০২১
- চাকদহ: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পবিত্র সরকার, সোম পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: ২০২৩
- চোর ও অন্যান্য নাটিকা, কৌশিক সেন, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬
- তাহার নামটি রঞ্জনা ও অন্যান্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য, নবগ্রন্থ কুটির, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮
- তিনটি বিচিত্র পূর্ণাঙ্গ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৫,
- থিয়েটার যা দেখায় তা নিয়ে লেখা, বিভাষ চক্রবর্তী, প্রতিভাস,, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
- থিয়েটারের কথা, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
- থিয়েটারের জলহাওয়ায়, সম্পাদনা: শেখর সমাদ্দার ও মিলি সমাদ্দার, প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০২২
- থিয়েটারের ভাষা, বাদল সরকার, কালি কলম ও ইজেল, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মাঘ ১৪২৯/ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- দানসাগর ও অমিতাক্ষর, দেবাশিষ মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২/মাঘ ১৪১৮

- নন্দিত ৩৫ সৃজন ও সত্য, আশিষ গোস্বামী, ঋত্বিক, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ: ৯ ডিসেম্বর ২০১৪,
- নয় এক্কে নয়, ইন্ড্রাশিস লাহিড়ি, কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০,
- নয় নাটক, অভি চক্রবর্তী, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৭,
- নাটক ও নাট্যকার, অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২১/ফাল্গুন ১৪২৭
- নাটক সৃজন: নাট্যচর্চা, চন্দন সেন, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০১৪,
- নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, পবিত্র সরকার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬
- নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, শেখর সমাদ্দার, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮
- নাট্যসমগ্র, ব্রাত্য বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৭
- নাটক সমগ্র ৩, ব্রাত্য বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৬,
- নাটকসমগ্র ১, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৯,
- নাটকসমগ্র ১: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা: সৌভিক রায়চৌধুরী ও সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪২৬/জুলাই ২০১৯
- নির্বাচিত নাটক, চন্দন সেন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৪,
- নাটকসমগ্র ৩, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৮,
- নেমেসিস, সম্পাদনা ও নির্দেশনা-অভি চক্রবর্তী, অভিযান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৬,
- পঞ্চব্যঞ্জন, দেবব্রত দাশগুপ্ত, কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৩,
- পঞ্চাশে একশো, সম্পাদক: অভি চক্রবর্তী,
- পপুলার পাঁচ নাটক, চন্দন সেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২০/বৈশাখ ১৪২৭,
- পথের শেষ কোথায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বাদশ সংস্করণ: মাঘ ১৪২৪/জানুয়ারি ২০১৮,
- পড়ে পাওয়া ষোলো আনা, খরাজ মুখোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ২০২৩,
- পূর্ণাঙ্গ নাটক সমগ্র, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৩/বৈশাখ ১৪৩০,
- বাবরের প্রার্থনা, ব্রাত্য বসু, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৯ জৈষ্ঠ্য ১৪১৬/২৪ মে ২০০৯,
- বাংলা নাটকের ইতিহাস, ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮, আশ্বিন, ১৪২৫,

- বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা, আশিষ গোস্বামী, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০২১,
- বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২০১৬
- বিকেলে ভোরের সরষে ফুল, ব্রাত্য বসু, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৯ জৈষ্ঠ্য ১৪১৬/২৪ মে ২০০৯,
- বিলে ও দাদাঠাকুর, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩,
- বিষয় যখন নাটক, দীপেন্দু চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪২৫/জানুয়ারি ২০১৯,
- বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, সম্পাদক-স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ২০১০
- বিশ্বায়নের তিন দশক, অনিন্দ্য ভুক্ত, বোধিসত্ত্ব, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
- বীরভূমের নাট্য ইতিহাস, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০২১,
- ভয়, ব্রাত্য বসু, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৯ জৈষ্ঠ্য ১৪১৬/২৪ মে ২০০৯,
- মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ, পুলিন দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ২৫ বৈশাখ ১৪১৯
- মঞ্চ-চিত্রের বৃত্তান্ত, সম্পাদনা-দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০২১
- মঞ্চ শব্দ-বিজ্ঞান ও শব্দ-সংযোজন, নীরদবরণ হাজারা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬
- মরিচকাঁপি ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস, মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ: ২০১৬
- মরণস্বর্গ, আবুল বাসার, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ষষ্ঠ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৯,
- ম্যাকবেথ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৬,
- যেখানে বিচ্ছেদ, জয় গোস্বামী, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮,
- রঙ্গনাট্য সংগ্রহ ১, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২৪,
- রঙ্গবতী, খরাজ মুখোপাধ্যায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০২৩,
- রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, নবম সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৬
- রাজাবলী, আবুল বাসার, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৭,
- শ্রেষ্ঠ নাটক একাদশ, মনোজ মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৯/বৈশাখ ১৪২৬,

- সমাজ সচেতনতা ড্রাগ ও দূষণ বিরোধী নাটক, অমল রায়, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা , প্রথম প্রকাশ: ২০২০,
- সাতপাক, স্রোতস্থিনী দে, প্যাপিরাস, কলকাতা , জানুয়ারি ২০১৪/মাঘ ১৪২০,
- সুন্দর নাট্যসম্ভার ২, সংকলন ও সম্পাদনা: মনোজ মিত্র ও ময়ূরী মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩/মাঘ ১৪১৯,
- In search of a Valmiki, Sujit Bhar, Boichitra, Kolkata, march 2021
- Scenography An Indian Perspective , Satyabrata Rout, Niyogi Books, New Delhi, 2022

প্রকল্প - অতিমারী উত্তরপর্ব : পশ্চিমবঙ্গে মহিলা শিল্পীদের জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতা, মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১-২০২২

নাট্য পত্রিকা -

- অন্য, সংখ্যা ৫, পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩, সম্পাদক-বিভাস চক্রবর্তী
- চেতনা ৫০, চেতনা নাট্যপত্র, ২০২২
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০১৫, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০১৬, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০১৭, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০১৮, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০১৯, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- দেশ বিদেশের নাট্য মেলা ২০২২, ঋত্বিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, সত্য ভাদুড়ি, প্রকাশ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
- নাট্যচিন্তা, মহিলা পরিচালক, সম্পাদক-তন্দ্ৰা চক্রবর্তী, সংখ্যা, বর্ষ ৪২, ২০২৩
- নাট্যচিন্তা, সম্পাদক-তন্দ্ৰা চক্রবর্তী, বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১-৬, নভেম্বর ২৩—এপ্রিল ২০২৪
- নাট্যপত্র ২০২৩, বিংশতিতম সংখ্যা, সম্পাদক-ডা. তপনজ্যোতি দাস
- নান্দীপট, বার্ষিক নাট্যপত্র, ৩য় বর্ষ, ২০২১, কলকাতা
- ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, ষোড়শ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, কলকাতা
- পঞ্চগণ্ডে একশো, অমল আলো প্রকাশ, অশোক নগর, ২০১৭
- পালা দৃশ্যকাব্য, ৩৪ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০২০, হাওড়া
- বালার্ক নাট্যপত্র, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩

- রঙ্গপট নাট্যপত্র, অষ্টাদশ সংখ্যা, ২০২১, কলকাতা
- সায়ক নাট্যপত্র, নাটক সংখ্যা, ১৩(২১), ২০১৫, কলকাতা
- সায়ক নাট্যপত্র, নাটককার সংখ্যা, নবপর্যায়, ১৬(২৪), ২০২০
- সায়ক নাট্যপত্র, বর্ষ ৮, সেপ্টেম্বর ২০২০, সম্পাদক-মেঘনাদ ভট্টাচার্য
- সায়ক নাট্যপত্র, নাট্যালোচনা সংখ্যা, নবপর্যায়, ১৪(২২), ২০১৬
- সায়ক নাট্যপত্র, সাক্ষাৎকার সংখ্যা, নবপর্যায়, ১৭(২৫), ২০২২
- স্যাস নাট্যপত্র ৩৫, নাট্যবিষয়ক বার্ষিকী ২০২২

পরিশিষ্ট : ১

জেলাভিত্তিক নাট্যচর্চার ধারা (সাক্ষাৎকারধর্মী)

কলকাতা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার রিপোর্টরি

(নাটক বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক শান্তনু দাসের সঙ্গে আলোচনা সূত্রে সংগৃহীত তথ্য)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হল পূর্ব ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেটি তার প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য একটি থিয়েটার রিপোর্টরি স্থাপন করেছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে চিহ্নিত করার জন্য থিয়েটারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। থিয়েটার রিপোর্টরির মূল উদ্দেশ্য হল সারা দেশে থিয়েটার সম্পর্কিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া। তরুণ শিল্পীদের থিয়েটারের পেশাদার জগতে পা রাখার জন্য এবং নাট্যজগতের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রায় ২০ বছরের নিরন্তর প্রচেষ্টার পর, ২০১৪ সালের অক্টোবরে অবশেষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরীর বিশেষ সহায়তায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি থিয়েটার রিপোর্টরির সূচনা হয়। এ বিষয়ে রিপোর্টরি করার জন্য বিশেষভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন প্রাক্তন নিবন্ধক ডভাস্কর সেনগুপ্ত এবং বিত্ত আধিকারিক শ্রী দেবদত্ত রায়। রিপোর্টরির সম্পাদক হিসেবে . নহা রায় এবং অধ্যাপক সৌমিত্র বৃশ্চব্রত সি, অধ্যাপক পীযুষ চক্রবর্তীর উপদেষ্টায় এবং প্রধান নির্বাহী সদস্য হিসাবে শ্রী বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের মতো বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতা ও নির্দেশনাসহ রিপোর্টরি করার লক্ষ্যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে নিয়ে যায় এবং রিপোর্টরির কাজকর্ম চলতে থাকে।

ক্রমিক	নাট্যপ্রযোজনা	প্রথম ও শেষ	স্থান	নাটককার/অনুবাদক	নির্দেশক	অভিনয় সংখ্যা
--------	---------------	-------------	-------	-----------------	----------	---------------

		অভিনয়				
১.	বন্দি বিহঙ্গ	২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭	জোড়াসাঁকো ঠাকুর দালান ও রাজীবপুর গার্লস স্কুল	নাটককার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেবশিস চক্রবর্তী	৪০
২.	ফাগুন রাতের গল্পো	২০ মার্চ ২০১৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	জোড়াসাঁকো ঠাকুর দালান ও এলটিডি অডিটোরিয়াম, এন এস ডি ফেস্টিভ্যাল, নিউ দিল্লি	নাটককার-উইলিয়াম শেক্সপীয়ার, অনুবাদক- সৌমিত্র বসু	ড. তরণ প্রধান	৪৫
৩.	বিসর্জন	১৬ জানুয়ারি ২০১৬ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬	আইসিসিএস, অডিটোরিয়াম ও মিনার্ভা থিয়েটার হল	নাটককার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড. সৌমিত্র বসু	৬
৪.	শারদোৎসব	২২ জানুয়ারি ২০১৭	মিনার্ভা থিয়েটার	নাটককার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড. দেবশিস রায়চৌধুরী	১০
৫.	আলাদিন	২০ মে ২০১৮ ও ৭ সেপ্টেম্বর	গিরিশ মঞ্চ ও মধুসূদন মঞ্চ	নাটককার-সোমনাথ সিংহ	ড. সোমনাথ সিংহ	৫

		২০১৮				
৬.	যখন অন্ধ প্রকৃতি চণ্ডালিকা	৯ মে ২০১৯ ও ১১ নভেম্বর ২০২২	জোড়াসাঁকো কবিপক্ষ ও জোড়াসাঁকো	নাটককার-শুভাশিষ গাঙ্গুলি	ড. শুভাশিষ গাঙ্গুলি	১১
৭.	মেচ দেশের কন্যা	৩১ ডিসেম্বর ২০২২	জোড়াসাঁকো ঠাকুর দালান	নাটককার-সৌমিত্র বসু	ড. তরণ প্রধান	১২

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার রেপার্টরীর ২০২৪-এর প্রযোজনা, নতুন নাটক 'ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা', নাটককার রতন মানওয়ামান্ন। নির্দেশক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের অধ্যাপক গগণদীপ। গগণদীপ ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার প্রাক্তনী এবং পাতিয়ালা পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে থিয়েটারে কৃতিত্বের সঙ্গে মাস্টার্স করেন।

জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা

- নাট্যদলের নাম- অশোকনগর নাট্যমুখ
নির্দেশক- অভি চক্রবর্তী
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল- ২০০০ সাল
- নাট্যদলের নাম - বারাসাত কাল্পনিক
নির্দেশক - দেবব্রত ব্যানার্জী
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল - ৩ জানুয়ারি ২০১১
- নাট্যদলের নাম-ঋতম্, মধ্যমগ্রাম
নির্দেশকের নাম- গৌতম সেনগুপ্ত
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৬ সাল
- নাট্যদলের নাম- বারাসাত জাগরী (বারাসাত ইভনিং ক্লাবের নাট্যশাখা)
সম্পাদক- শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান পরিচালক- সমরেশ বসু

- নাট্যদলের নাম- হিজলপুকুরিয়া জনজাগরণী, বাণীপুর
বর্তমান নির্দেশক- রূপশ্রী সাহা
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৯৮ সাল

জেলা : হুগলী

- নাট্যদলের নাম- এষণা, চুঁড়া
বর্তমান নির্দেশক-সম্পাদক প্রদীপ বসু ঠাকুর এবং নাটককার ও পরিচালক
একজনই শঙ্কর বসু ঠাকুর।
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল- ২০২৪ সালের ১ মে,

জেলা : হুগলী

- নাট্যদলের নাম- ক্লাসিক থিয়েটার, চন্দননগর
বর্তমান নির্দেশক-পরিচালক চিন্তা মুখার্জি এবং সম্পাদক তুষার ভট্টাচার্য।
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল-১৯৭২-এর ২২ জুন

জেলা - মুর্শিদাবাদ

- নাট্যদলের নাম—ঋত্বিক
নাট্যদলের কর্ণধার/প্রযোজক/সম্পাদক—সম্পাদক-মোহিত বসু অধিকারী।
নাট্যদলের প্রারম্ভিক কাল বা প্রতিষ্ঠা পর্ব—৮ মে ১৯৮০।
- নাট্যদলের নাম — যুগান্তি
নাট্যদলের কর্ণধার/প্রযোজক/সম্পাদক—অনুপম ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক)
নাট্যদলের প্রারম্ভিক কাল বা প্রতিষ্ঠা পর্ব—১৯৭৪ সাল

জেলা - উত্তর দিনাজপুর

- নাট্যদলের নাম—কালিয়াগঞ্জ অনন্য থিয়েটার।
নাট্যদলের কর্ণধার/প্রযোজক/সম্পাদক—বিভূভূষণ সাহা (দলের প্রতিষ্ঠাতা)
নাট্যদলের প্রারম্ভিক কাল বা প্রতিষ্ঠা পর্ব—২২ মার্চ, ১৯৯২।

জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর

- নাট্যদলের নাম - 'ত্রিতীর্থ'।
নাট্যদলের কর্ণধার/প্রযোজক/সম্পাদকের নাম-
সম্পাদক-গোবিন্দ সরকার আর আজীবন সভাপতি-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।
প্রতিষ্ঠা - ১৯৬৯ সালের ২৬ আগস্ট।
- নাট্যদলের নাম - বালুরঘাট নাট্যতীর্থ।
সম্পাদক পরিমল মজুমদার। নির্দেশক শুভাশিস চক্রবর্তী।
প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৮২ সালে

জেলা - মালদা

- নাট্যদলের নাম—বিষাণ একটি নাট্য সংস্থা। গাজোল
নাট্যদলের কর্ণধার—তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক-গদাধর রায়।
নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাকাল—১৯৭৭ সাল ১২ই মে।
- নাট্যদলের নাম — মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম
নাট্যদলের কর্ণধার/প্রযোজক/সম্পাদক—সম্পাদক-সঞ্জীব কুমার দাস, প্রেসিডেন্ট-মান্না হালদার, নির্দেশক-সুব্রত পাল
নাট্যদলের প্রারম্ভিক কাল বা প্রতিষ্ঠা পর্ব—
- আমাদের নাট্যদলের কাজ শুরু হয় ২০০৫ সালে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এই নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর।

জেলা - আলিপুরদুয়ার

- নাট্যদল : রানার নাট্য সংস্থা, ফালাকাটা

কৰ্ণধার : দিলীপ সরকার

জেলা – দার্জিলিং

- উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী, শিলিগুড়ি

পরিচালক- পলক চক্রবর্তী

প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৭

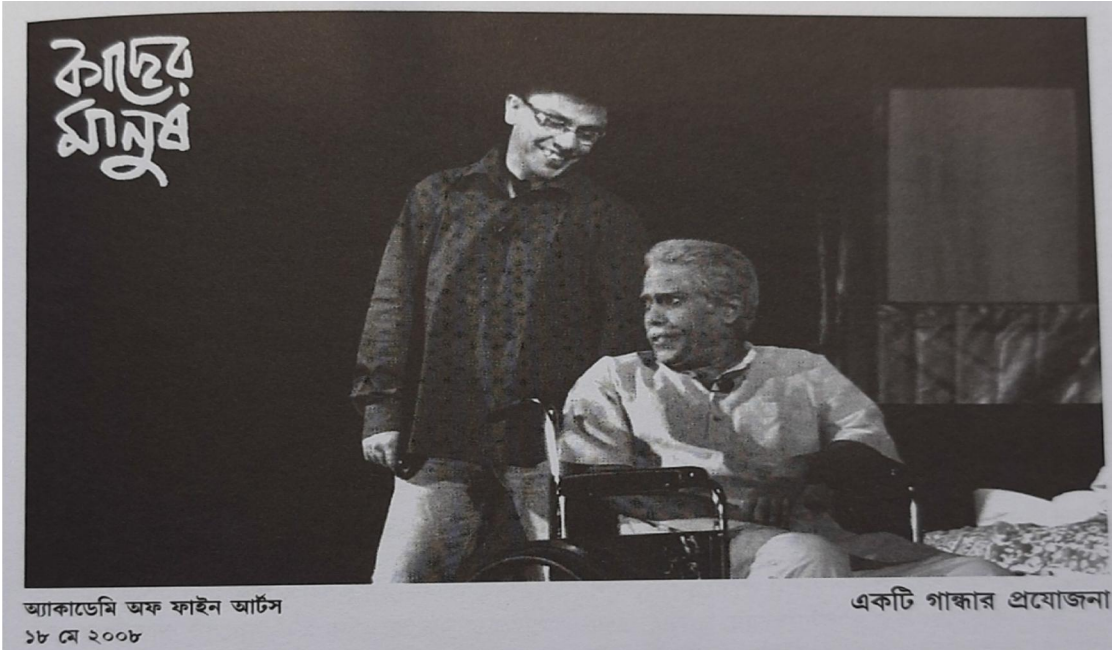
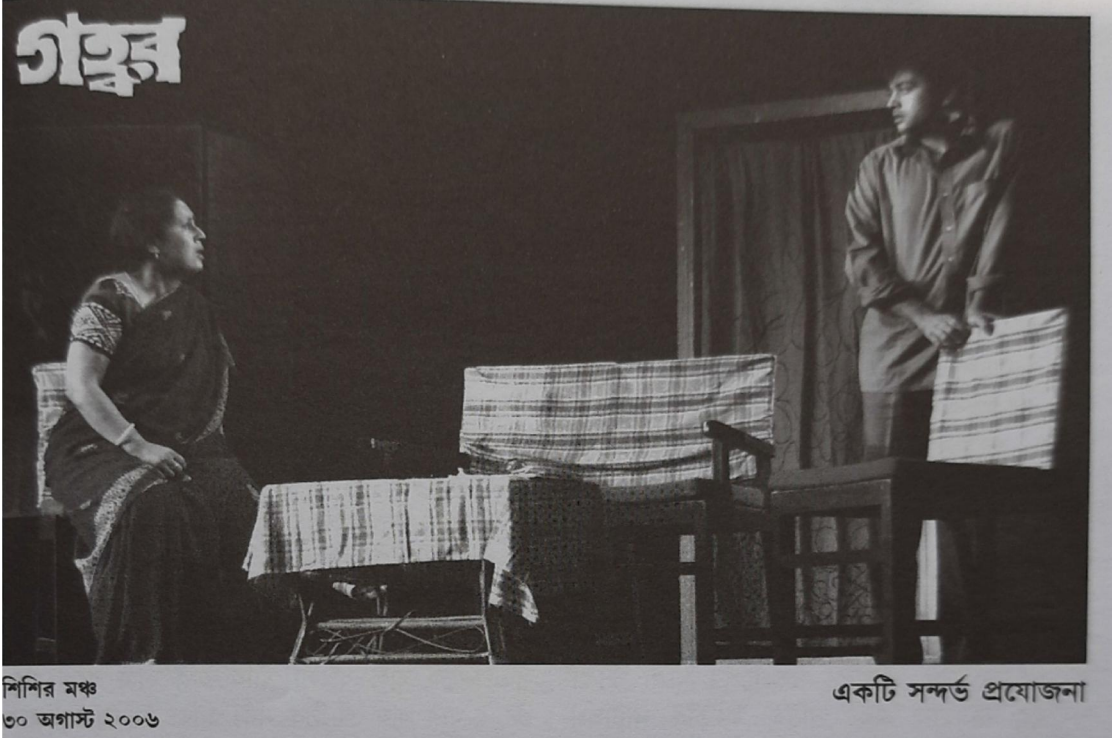
জেলা – জলপাইগুড়ি

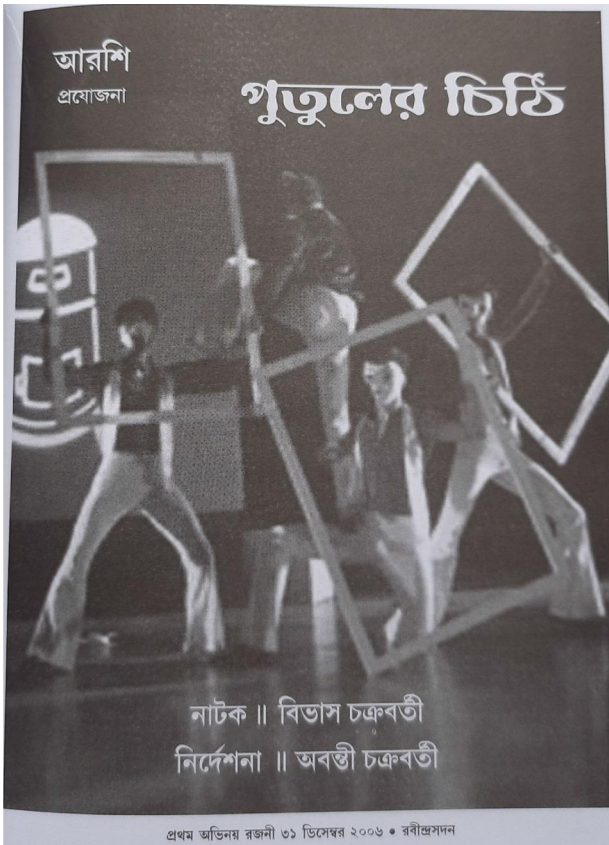
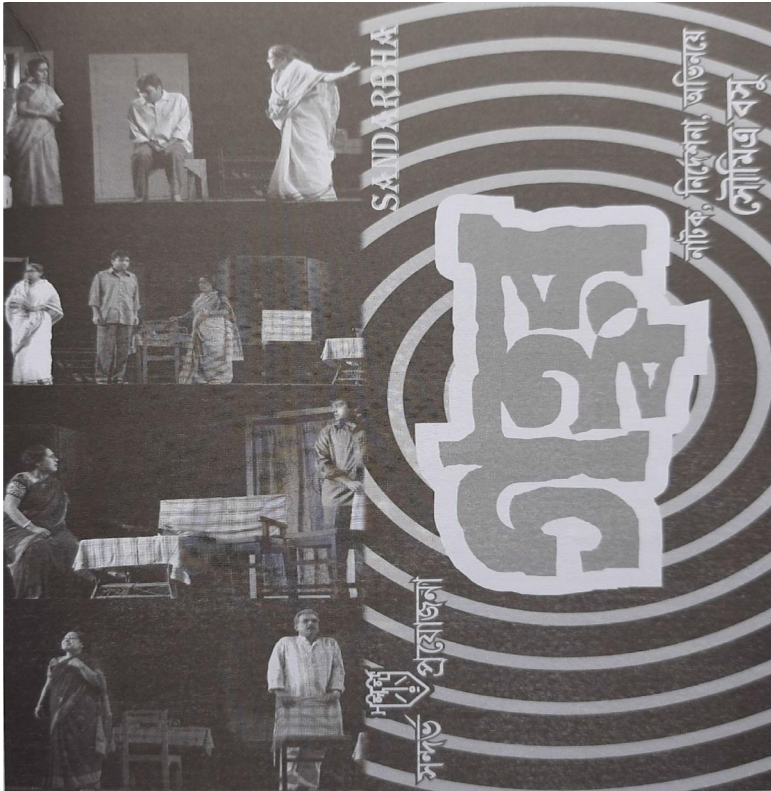
- তরুণ নাট্য সংস্থা, ধুপগুড়ি

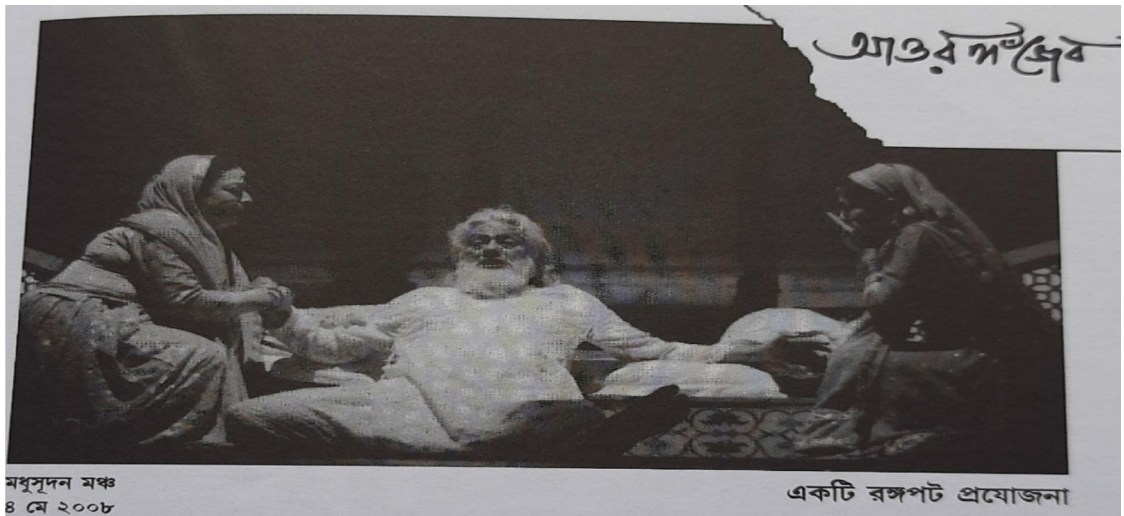
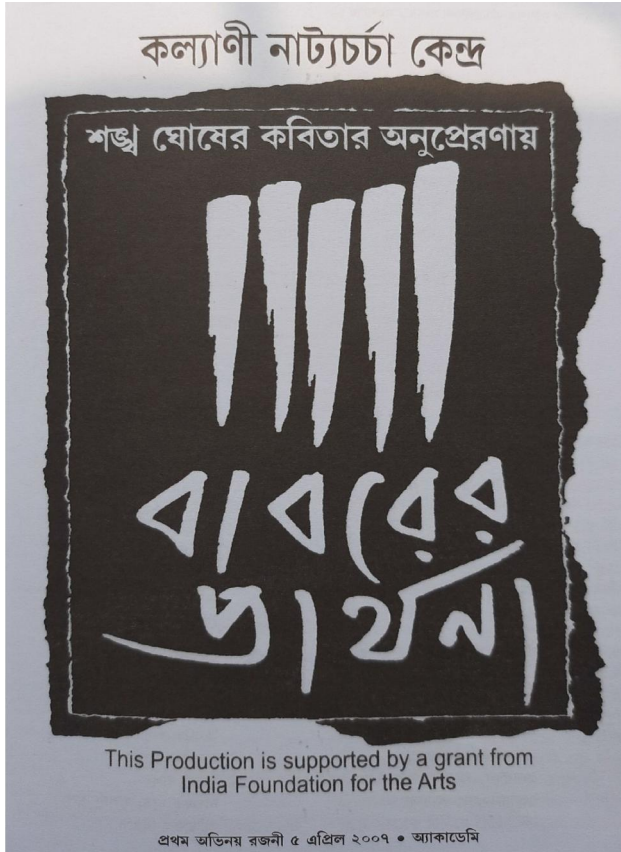
সম্পাদক - বাপ্পা পাল

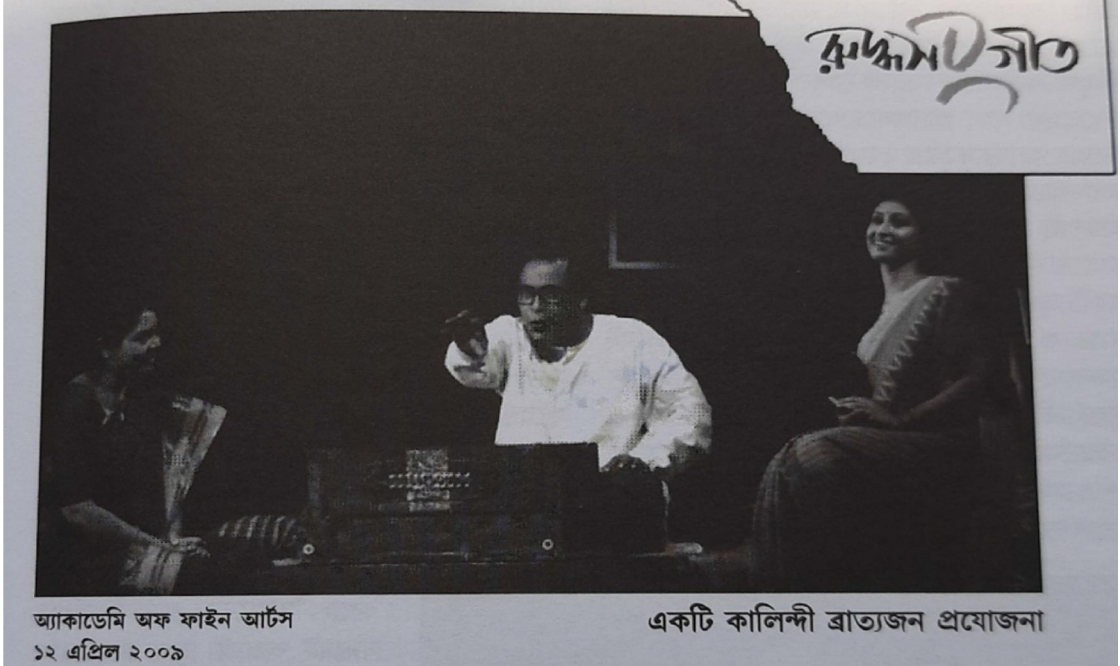
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৭৬ সালে

পরিশিষ্ট : ২
নাট্য দৃশ্য ও নাট্যচর্চার বিভিন্ন চিত্র



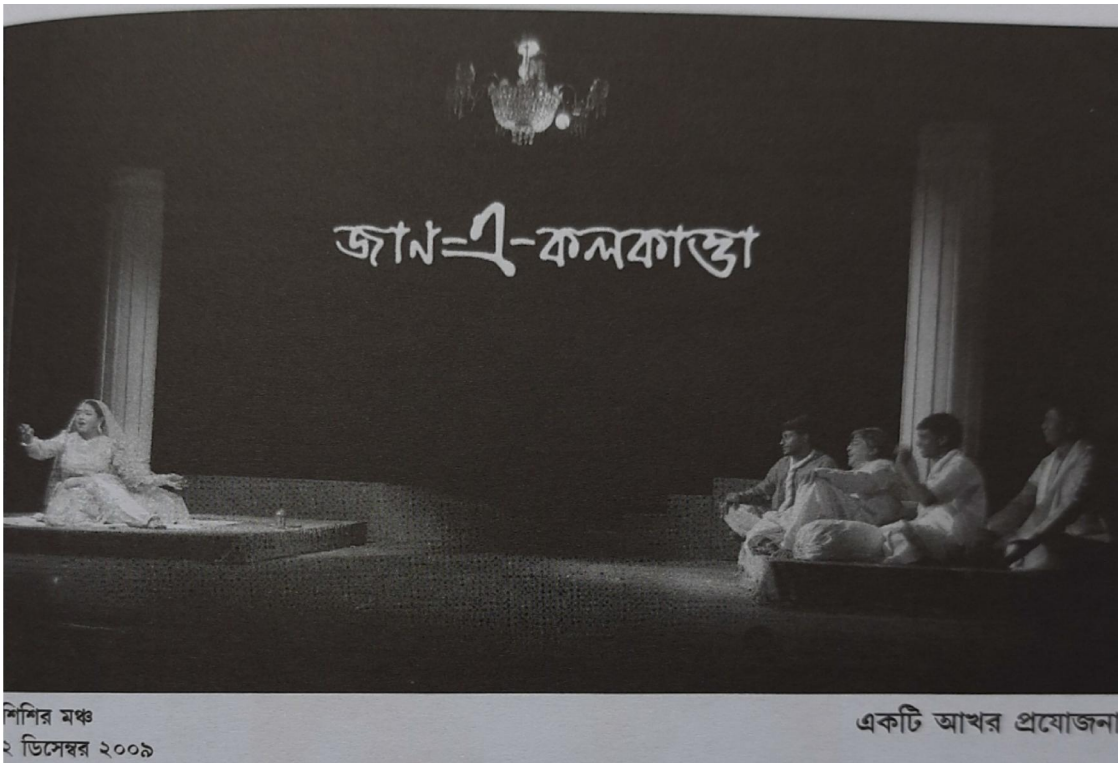






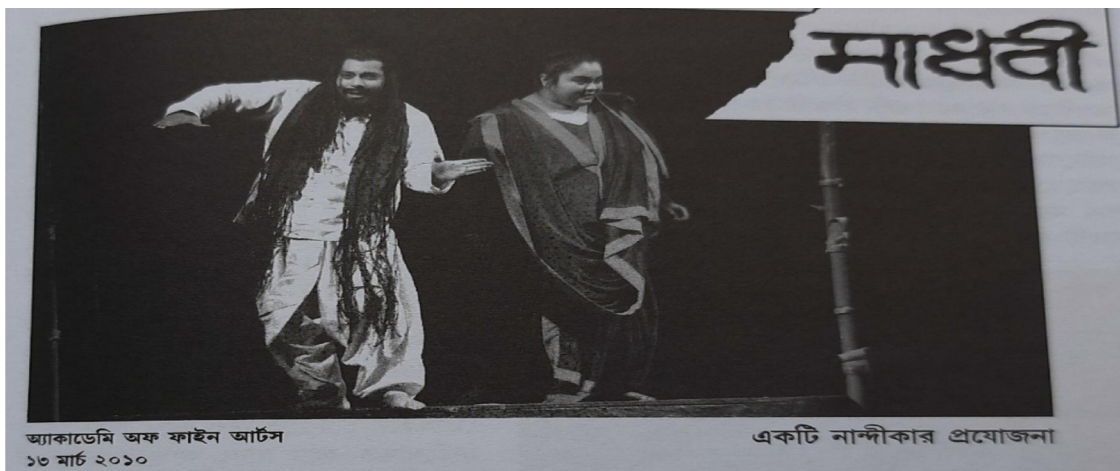
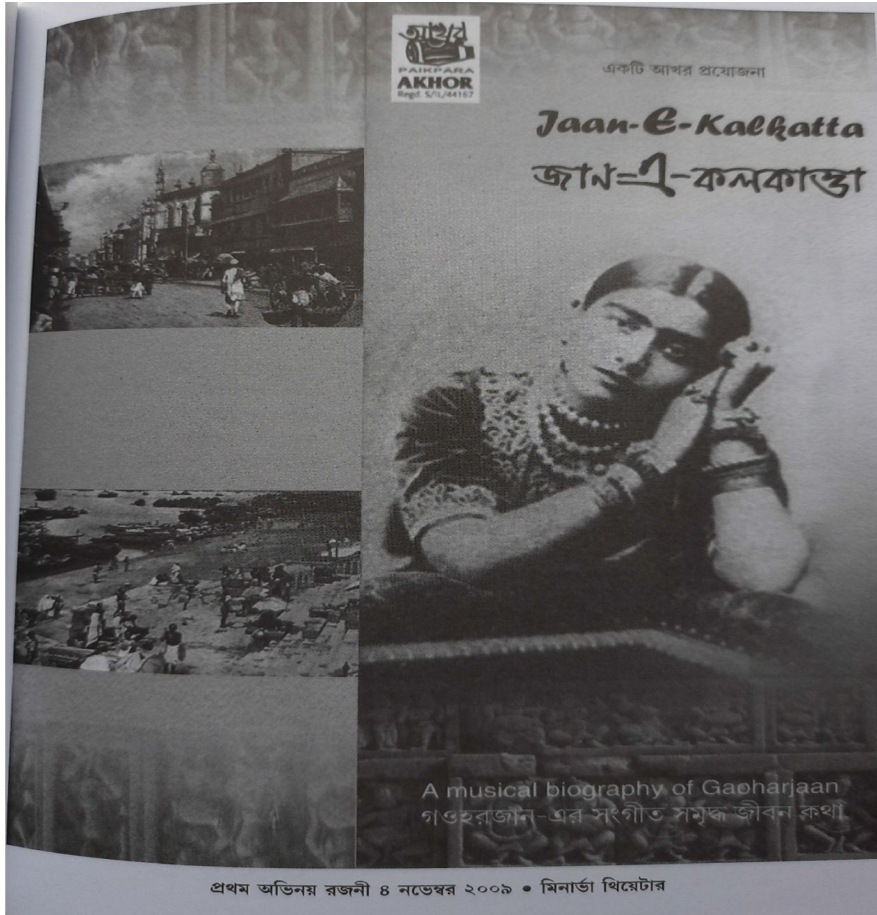
অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস
১২ এপ্রিল ২০০৯

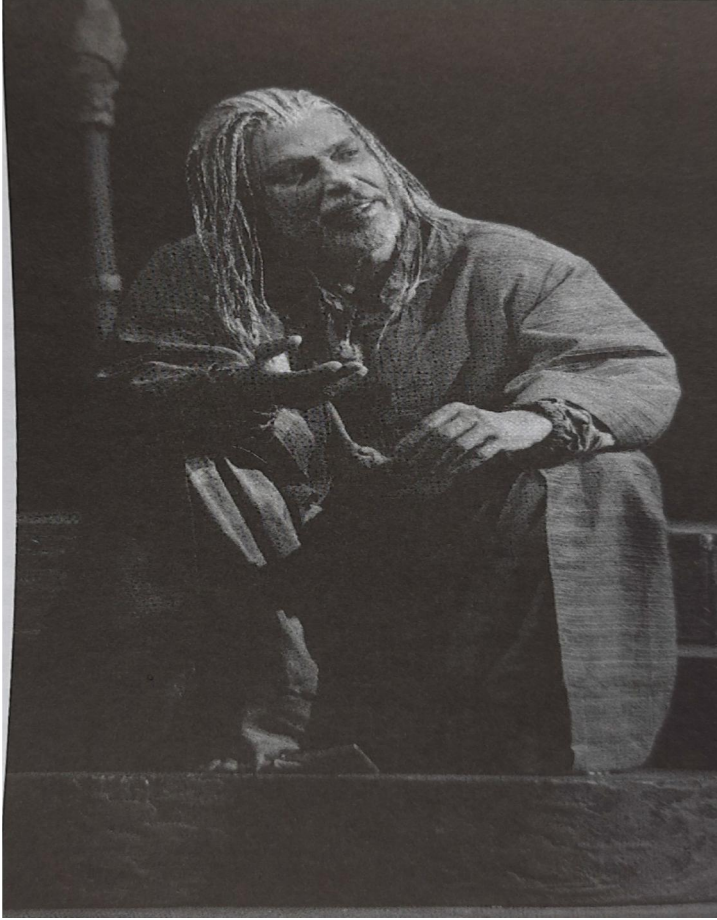
একটি কালিন্দী ব্রাত্যজন প্রযোজনা



শিশির মঞ্চ
২ ডিসেম্বর ২০০৯

একটি আখর প্রযোজনা





মাধবী নাটকের যযাতির ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

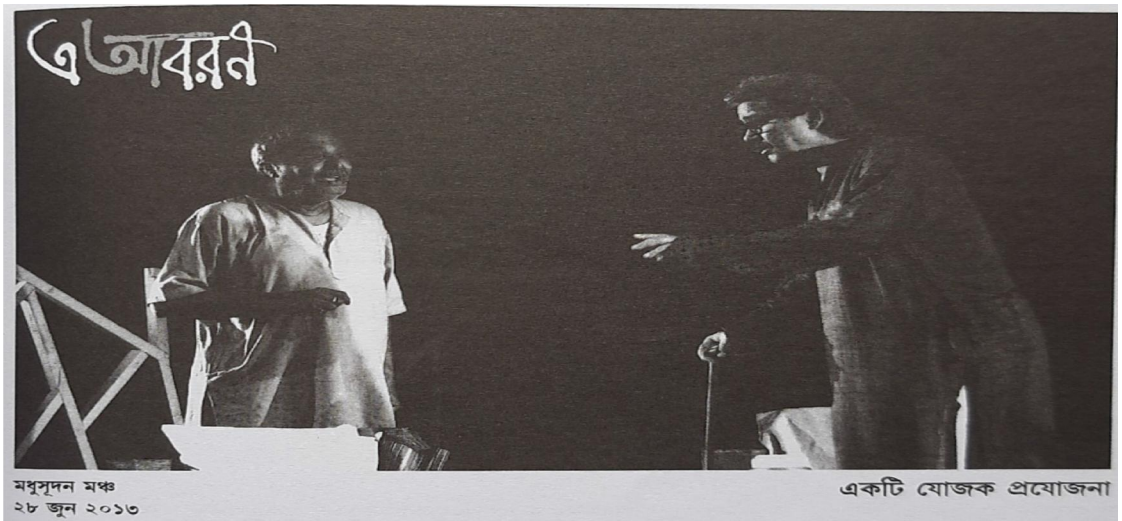
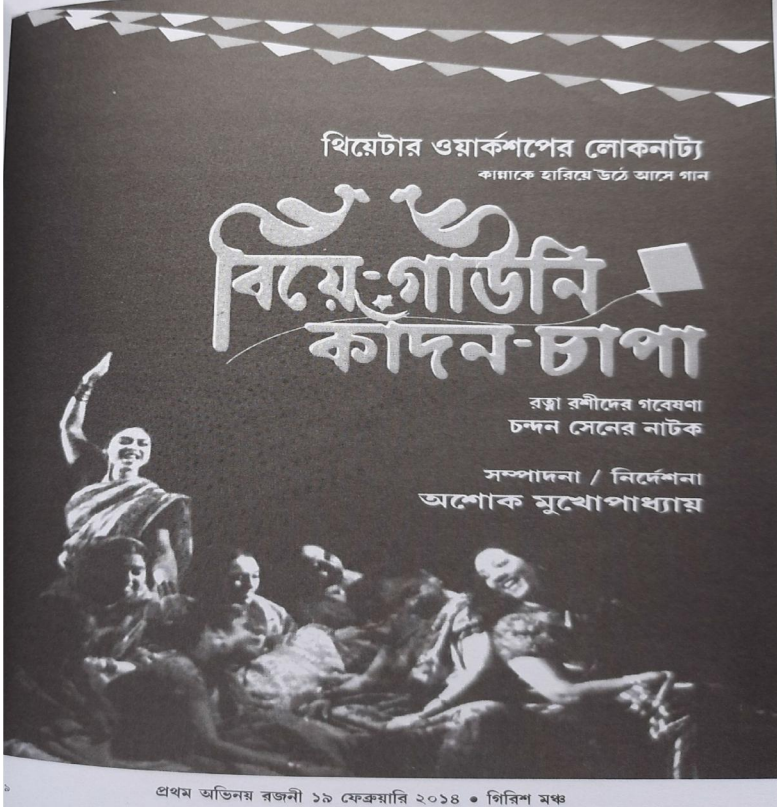


জ্ঞান মঞ্চ
৩১ অগাস্ট ২০১১

একটি স্বপ্নসন্ধানী প্রযোজনা

বালিগঞ্জ
 স্বল্পপ্রচনা-র নতুন প্রযোজনা
 বিজয় মুখোপাধ্যায় নিবেদিত
 Play : Vijay Tendulkar Transcription : Vina Alasey
 নাটক : বিজয় তেডুলকর অনুবাদ : বীণা আলাসে
কন্যা দান
 KANYADAAN
 সম্পাদনা ও নির্দেশনা : ব্রাত্য বসু
 C A S T
 Swatilekha Sengupta Sohini Sengupta Meghnad Bhattacharya Bratya Basu Bijoy Mukhopadhyay
 Sena Jyoti Nath Deolalkar Arun Athole Jayprakash
 প্রথম অভিনয় রজনী ৪ ডিসেম্বর ২০১০ • অ্যাকাডেমি

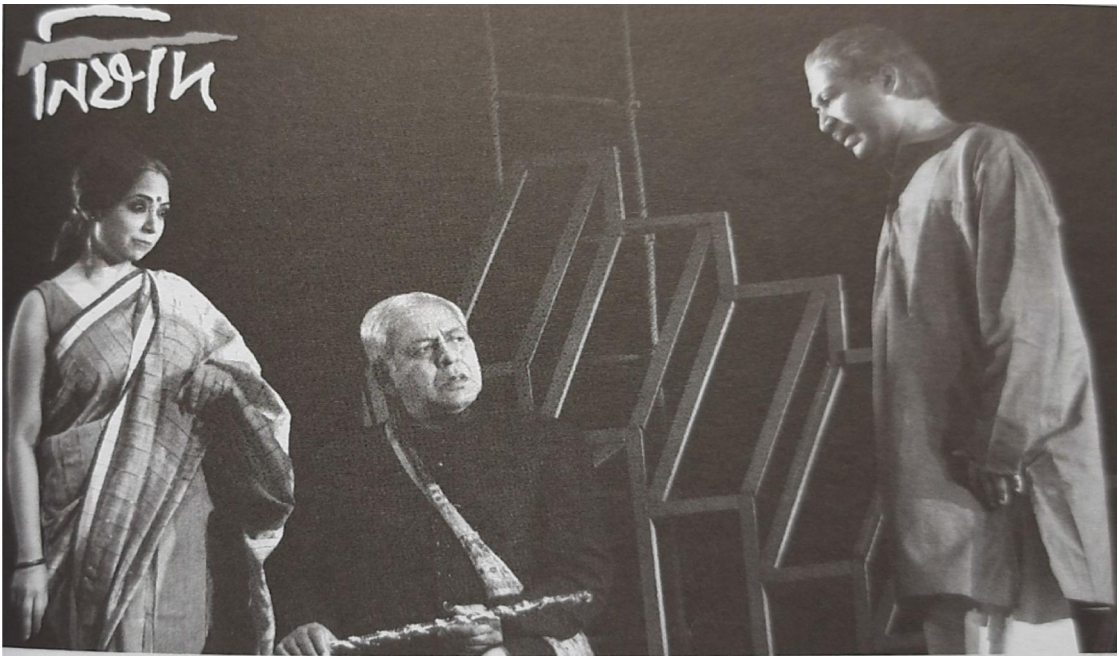
আ শ্ৰেষ্ঠাৰ্থ
 যমন্টু সি
 মধুসূদন মঞ্চ
 ১ জুলাই ২০১২
 একটি সুন্দরম প্রযোজনা





জ্ঞান মঞ্চ
১৮ নভেম্বর ২০১৬

একটি নির্ণয় প্রযোজনা



স্টাডেন্টস অফ ফাইন আর্টস
জুন ২০১৬

একটি একুশ শতক প্রযোজনা



KASBA ARGHYA PRESENTS

भारत कथा

DIRECTION : MANISH MITRA



प्रथम अभिनय रजनी ७० जुलाई २००६ • अकाडेमि

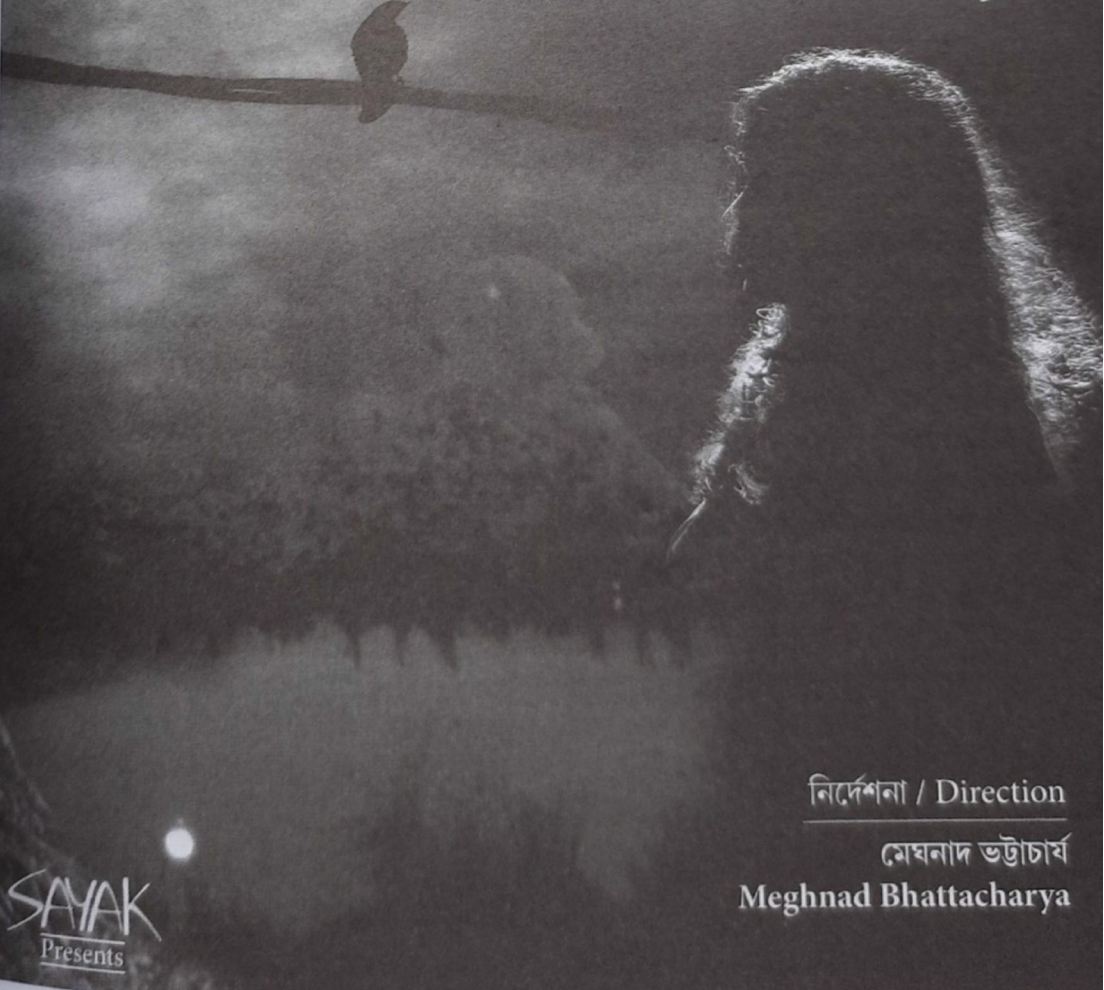


এক অলোক সাধারণ মেয়ের কাহিনি



দামিনী হে

Daamini-Hay



নির্দেশনা / Direction

মেঘনাদ ভট্টাচার্য

Meghnad Bhattacharya

SAYAK
Presents

প্রথম অভিনয় রজনী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ • মধুসূদন মঞ্চ



অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস
২৫ নভেম্বর ২০১৫

একটি হযবরল প্রযোজন





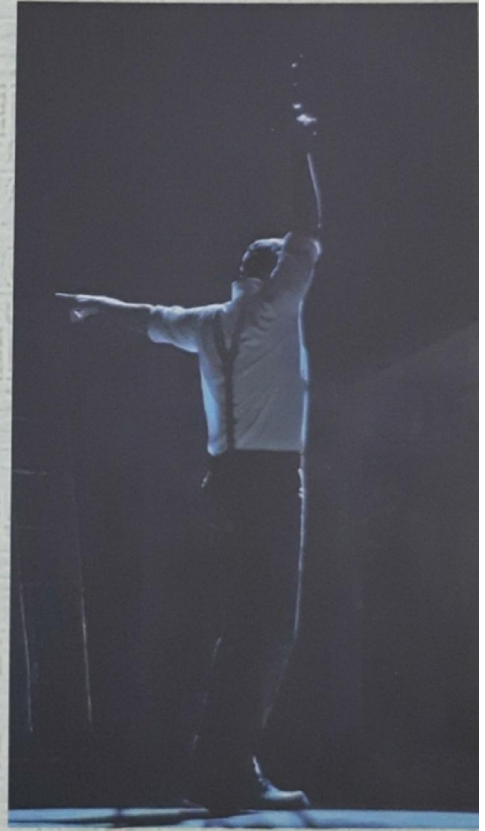
শিশির মঞ্চ
৯ আগস্ট ২০০৮

একটি বিডন স্ট্রিট শুভম্ প্রযোজনা

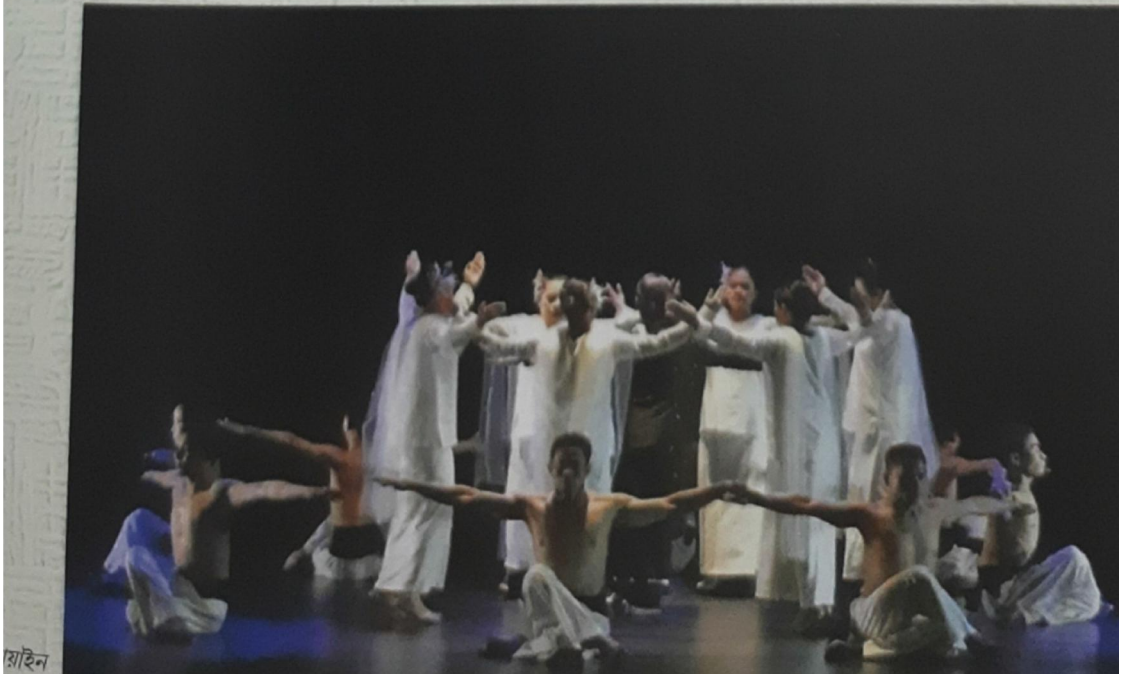
বহিষ্কৃত নাট্যদলে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দীনেশ পোদ্দার-কৃত আলোকচিত্রণের কয়েকটি ছবি



শ্রেষ্ঠ আলো শিল্পী পুরস্কার, ২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



মেফিস্টো



হায়হিন

বিভিন্ন নাট্যদলে মহম্মদ আলি-কৃত রূপচিত্রণের কয়েকটি ছবি

